নু-কাননের নবপর্য্যায়।

(দ্বিতীয় পুস্তক)

শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল বি, এ প্রণীত।

আনা]

PAUL, BHATTACHARYYA & Co.

গল্প
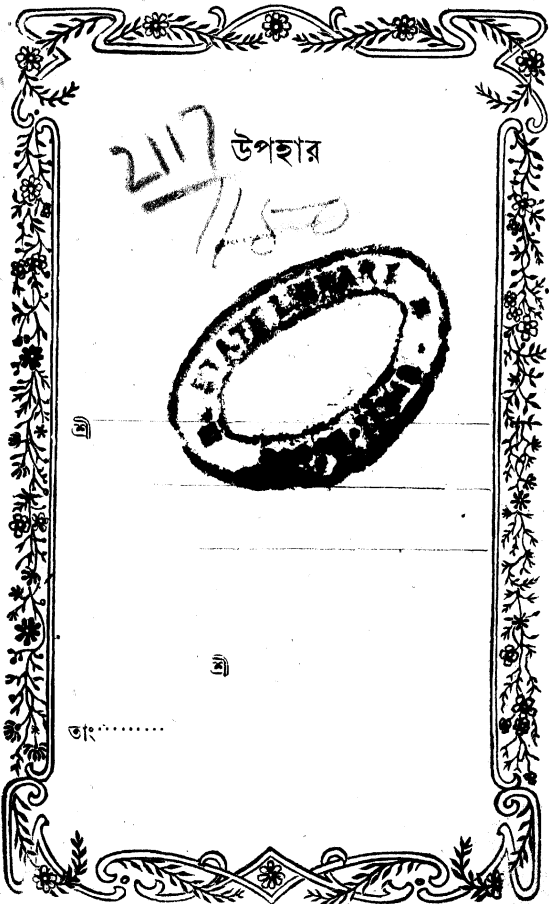
সম্পত্তিরক্ষা

১

রামরামবাবুর যে গ্রামে বাস, সে গ্রামটি বেশ সমৃদ্ধ। কিছুদিন হইতে ম্যালেরিয়াও গ্রামখানির উপর কৃপাদৃষ্টি করেন নাই, কিন্তু স্বইচ্ছায় নহে। গ্রামের লোকে তাঁহাকে নানারূপে উদ্‌বাস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার প্রিয় বাসভূমি,—যেখানে থাকিয়া তিনি বহুদিন হইতে দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে সমগ্র গ্রামখানিকে কঠোর পীড়ন করিয়া আসিতেছিলেন, এইবার লোকে তাহা আর সহ্য করিতে না পারিয়া, মরিয়ার মত তাঁহার বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার সেই প্রিয় বাসভূমির অস্তিত্ব প্রায় লোপ করিবার মত করিয়াছে। গ্রামের চতুর্দ্দিকে, ভিতরে বাহিরে পাকা কাঁচা নালানর্দ্দমা কাটিয়া এমন ভাবে সুরক্ষিত করিয়া ফেলিয়াছে যে, ম্যালেরিয়া আর সে অঞ্চলে ঘেঁসিতে সাহস করেন নাই। দুই একবার যে তিনি সেখানে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করেন নাই, এমন কথা বলিতে পারা যায় না, কিন্তু দুই চারিবার এ নর্দ্দমা সে নর্দ্দমার মধ্যে গড়াগড়ি খাইয়া তিনি ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিয়াছেন। কিছুদিন পরে আবার ফিরিয়া আসিয়া বনজঙ্গলের মধ্যে লুকাইয়া গ্রামখানি আক্রমণ করিবার

চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু এ চেষ্টাও তাঁহার ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। গ্রামবাসি-নিয়োজিত কুলিমজুরের তীক্ষ্ণ কুঠারের আঘাতে বনজঙ্গলের অস্তিত্ব দেখিতে দেখিতে লোপ হইয়া গেল। যাক্ সে কথা, যাঁহারা গ্রামখানি ছাড়িয়া এত দিন সহরে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই একে একে গ্রামে ফিরিতে লাগিলেন। এবং সুস্থদেহে প্রফুল্লমনে জমি-জমা বিষয় সম্পত্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য নানা কৌশল অবলম্বনে প্রবৃত্ত হইলেন।

রামরামবাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কলিকাতায় কাজকর্ম্ম করিয়া বহু অর্থ সঞ্চয় করিয়া গিয়াছিলেন। তিনি আয়ের প্রায় সমস্তই গ্রামে বিষয়-আশয়, জমি-জমা ক্রয় করিতে ব্যয় করিয়াছিলেন, রামরামবাবু দেশে থাকিয়া বিষয়-আশয়ের দেখাশুনা করিতেন, এবং সেই সুযোগে গ্রামের মোড়ল হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার অগ্রজ হররামবাবু ছুটি উপলক্ষে বৎসরে দু'চারিদিন মাত্র দেশে থাকিতে পারিতেন। অনেকে তাঁহাকে কলিকাতায় বাড়ী করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া দেশেই একটি নাতিবৃহৎ চকমিলান দ্বিতল গৃহ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ও তল্লাটে ওরূপ গৃহ আর ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। হররামবাবু তিন কন্যা ও এক পুত্র রাখিয়া সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করিলেন। কন্যা তিনটি বড়, পুত্রটি ছোট। তিন কন্যাই সুপাত্রে পড়িয়াছিল। এক দরিদ্র গৃহস্থের সুলক্ষণা সুন্দরী কন্যার সহিত হররামবাবু তাঁহার পুত্রটির বিবাহ দিয়াছিলেন। সেও তাঁহার মৃত্যুর প্রায় সাত বৎসর পূর্ব্বে।

অগ্রজের দৌলতে রামরাম বেশ পাকা বিষয়ী হইয়া উঠিয়াছিলেন; তাই দাদার মৃত্যুর পর বৎসর ঘুরিতে না ঘুরিতে তিনি দাদার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি, এমন কি বাড়ীটি পর্য্যন্ত খাস নিজস্ব করিবার জন্য তৎপর হইয়া উঠিলেন। তিনি গ্রামের সকলকে বলিয়া বেড়াইতেন, "দাদা টাকা রোজগারই করিয়া

গিয়াছেন, কিন্তু বিষয়-সম্পত্তির কি বুঝিতেন—এ সমস্তই ত আমার করা। দেশের এই যে বাড়ী-ঘর, এও ত আমার বুদ্ধিতে; না হইলে তিনি ত কলিকাতায় বাড়ী করিবার জন্য ঝুঁকিয়াছিলেন।"

রামরামবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র রতন অত্যন্ত নিরীহ গোবেচারী রকমের। বিষয়-বুদ্ধি তাহার একেবারেই ছিল না। গ্রামের কাহারও কঠিন পীড়ার সংবাদ পাইলে সে রাত জাগিয়া সেবাশুশ্রূষা করিত, কেহ বিপদে পড়িলে সে সাধ্যমত অর্থ দিয়া তাহার সাহায্য করিত, শবদাহ করিবার লোকের অভাব হইলে সে গিয়া কাঁধ দিত। বাড়ীতে যতক্ষণ থাকিত, বই পড়িয়া সময় কাটাইয়া দিত। কাজেই এ হেন বিষয়বুদ্ধিহীন, খুল্লতাতনির্ভরশীল অকর্ম্মণ্য ভ্রাতুষ্পুত্রকে করতলগত করিতে পাকা বিষয়ী খুড়ামহাশয়ের বিশেষ কষ্ট পাইতে হইল না।

একদিন রামরামবাবু গ্রামের আর পাঁচজন বিশিষ্ট ভদ্রলোককে শুনাইয়া কহিলেন, "দাদা ছিলেন আমার শিবতুল্য, আর তাঁর ছেলে রতন এমন গোল্লায় যাইবে, এ যে আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। এই অল্প সময়ের মধ্যে সে যেরূপ দুর্দ্দান্ত মাতাল হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে বিষয়-সম্পত্তি আর বুঝি রক্ষা করা যায় না। এই বুড়া বয়সে আমি আর কত দিক্ সামলাইব।"

নরহরিবাবু কহিলেন, "সত্যই ত ভায়া, কোথায় তুমি এখন নিরালা জায়গায় বসিয়া সুস্থ মনে ভগবানের নাম করিবে, আর কিনা এই আপদ আসিয়া জুটিল। বিষয় সম্পত্তি ত তুচ্ছ ছার,—এই বৃদ্ধ বয়সে কিনা ভগবানের নাম না করিয়া বিষয়-সম্পত্তি লইয়া ডুবিয়া থাকিবে।"

রামরামবাবু আরও গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "তুমি যাহা বলিয়াছ নরহরি ভায়া, অতি সত্য অতি সত্য; কিন্তু কি করিব, আমরা পাপী যে, এ ছার বিষয়-সম্পত্তির মায়া জানিয়া শুনিয়াও কাটাইতে পারি না। নিজের জন্য আমি এক বিন্দু ভাবি না; আমি কবে কাশীবাসী হইতাম, যত ভাবনা

আমার এই রতনের জন্য। আহা সে যে পথে বসিবে ইহা আমার কিছু-তেই সহ্য হইবে না; পাপে ডুবিতে হয় তাহাও স্বীকার।"

তারকবাবু একধারে নীরবে বসিয়াছিলেন। এবার তিনি কহিলেন, "দেখ রামরাম, রতনকে ত আমি ছেলেবেলা থেকে জানি, এক মাস পূর্ব্বেও ত সে এমন ছিল না, হঠাৎ কি করিয়া মাতাল হইয়া উঠিল বল ত? যাহাদের সঙ্গে মিশিয়া ও মদ খায়, তাহারা শুনিলাম নাকি সম্পর্কে তোমার সম্বন্ধী হয়?"

রামরাম হাসিয়া উঠিয়া কহিলেন, "তুমিও যেমন তারক, ঐ পাঁচবেটা মাতাল আমার সম্বন্ধী, তোমায় এ কথা বলিল কে হে?"

তারক কহিলেন, "ও পাড়ার ঘোষেদের বাড়ীর সকলে ঐ কথা বলিতেছিল; তা ছাড়া রতন যে তাহাদের মামা মামা করিয়া ডাকে, তাহা ত আমি নিজেই শুনিয়াছি।"

রামরাম কহিলেন, "রতন তাহাদের মামা বলিয়া ডাকে, কৈ—তা ত আমি একদিনও শুনিনি!" এই বলিয়া একটু উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিয়া কহিলেন, "তুমি দেখিতেছি তারক, এখনও সেই ছেলেমানুষটিই আছ! আরে রাম, এটুকু বোঝ না, মাতালরা যাহাকে মামা বলিয়া ডাকে, তাহা-কেই আবার শালা সম্বন্ধী বলিয়া গাল দেয়।"

তারক গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "তা হইবে। যাক্ গে, তা রতনকে ঐ দল হইতে ছাড়াইয়া লইবার জন্য তোমার চেষ্টা করা ত উচিত।"

রামরাম কহিলেন, "একশবার, দিনরাত ত আমার কেবল ঐ একই চিন্তা, কি করিয়া বিষয়-সম্পত্তি রক্ষা পায়। কি করিয়া রতনের উদ্ধার হয়। কিন্তু ঐ পাঁচ বেটা মাতালের সঙ্গে কিছুতেই পারিয়া উঠিতেছি না। বেটাদের যে রকম যণ্ডামার্কের মত চেহারা, দেখিলেই বুকটা কাঁপিয়া উঠে। বেটাদের ত একদিন লাঠি লইয়া তাড়া করিয়াছিলাম, কিন্তু

বুঝিলে ভায়া, তাহারা এমনই তাড়া করিয়া [illegible] রকমে পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিলাম। দেখ, তোমাদের যে জন্য ডাকিয়াছিলাম, সেই কথাটা আগে বলিয়া লই। ঐ দলের মধ্যে এক বেটা রতনের বিষয় সম্পত্তি ফাঁকি দিবার মতলব করিয়াছে, তাহার কি উপায় বল দেখি ?"

নরহরি প্রত্যুত্তরে কহিল, "তুমি ভায়া বিষয়ী লোক হইয়া আবার এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ ! তোমার ভাইপোর বিষয় পরে ফাঁকি দিয়া লইবে আর তুমি চুপ করিয়া থাকিবে ! আমার পরামর্শ যদি শুনিতে চাও, বিষয়-সম্পত্তি পরের হাতে যাইতে দিও না, তোমার হাতে থাকিলে ভাইপো ত আর পথে বসিবে না।"

রামরাম কহিলেন, "দেখ ভাইপোর বিষয় আমি রক্ষা করিতে পারি ; কিন্তু শেষে তোমরা পাঁচজনেই বলিবে, খুড়া ভাইপোর বিষয় ফাঁকি দিলে, অমন অধর্ম্মের কথা শুনিতেও আমি রাজি নই।"

নরহরি কহিলেন, "রামরামের দেখিতেছি বুড়া হইয়া বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারে লোপ পাইয়াছে। কোথায় কে কবে কি বলিবে, তাই ভাবিয়া অমনই পরের হাতে বিষয় তুলিয়া দিবে, ভাইপোকে পথে বসাইবে। আরে রেখে দাও অমন ধর্ম্ম তোমার সিকেয় তুলিয়া।"

রামরাম কহিলেন, "বিষয় সম্পত্তি যে পরের হাতে তুলিয়া দিয়া ভাইপোকে ভাসাইয়া দিব, ইহা আমার কুষ্ঠীতে লেখে নাই। তবে কথা হইতেছে, আমি খোলসা হইয়া কাজ করিতে চাই। তাই জামাই বাবাজীদের আসিতে বলিয়াছি। এখনই তাহাদের আসিবার কথা। তাহাদের সহিত পরামর্শ না করিয়া এ বিষয়সম্পত্তি সম্বন্ধে কোনরূপ ব্যবস্থা আমি ত করিতে পারি না। তোমাদের সকলের মত কি ?"

তারক কহিলেন, "দেখ রামরাম, আমি একটা কথা বলিতে চাই।

বিষয় পরের হাতে তুলিয়া দিতে যাইবেই বা কেন ? কিংবা নিজেরই বা রাখিবার দরকার কি ? রতন মদ খাক, আর যাই করুক, সে কখনও তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করিবে না। সে পাঁচজন বদ্ লোকের সঙ্গে পড়িয়া মদ ধরিয়াছে, ধরুক ; কিন্তু আমি জানি, তুমি যদি তাকে জোর করিয়া বল,তাহা হইলে সে এখনই ঐ সমস্ত বদ্লোকের সঙ্গ ত্যাগ করে।”

রামরাম বিশেষ গম্ভীর হইয়া কহিলেন, “তাহা হইলে তুমি কি বলিতে চাও, আমি তাহাকে মদ খাইতে নিষেধ করি নাই ? তুমি এখনকার ছেলেদের চেন না। তাহারা মনে করে, তাহাদের মত বুদ্ধিমান্ আর কেহ নাই ; খুড়ো,তাহাতে আবার বৃদ্ধ,সে বোঝে কি ? আমি মদ ছাড়িবার কথা বলিতে গিয়া দুই দুইবার অপমানিত হইয়াছি,আর আমি সে পথে হাঁটিতেছি না। অন্য কোন উপায় করিতে পার ত আমি এ দায় হইতে উদ্ধার হই।”

তারক চিন্তা করিতে লাগিলেন। রতনকে তিনি শিশুকাল হইতে দেখিয়া আসিয়াছেন, দশ বিশটা গ্রাম খুঁজিলেও এ রকম শান্তশিষ্ট বিনয়ী সরল ছেলে শতকরা একটা পাওয়াও অসম্ভব, তাই রতনকে তিনি সত্যই ভালবাসেন। সে যে কুসংসর্গে পড়িয়া সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইতে যাইতেছে, ইহাতে তিনি অন্তরের মধ্যে সত্যই বেদনা অনুভব করিতেছিলেন। রামরামের দুরভিসন্ধি তাঁহার অগোচর ছিল না। ক্রূরবুদ্ধি রামরাম যে ধর্ম্মের মুখোস আঁটিয়া, বাহিরে তিলক-চন্দনের ফোঁটা কাটিয়া, অন্যের চোখে ধূলি দিয়া, রতনের মত ভ্রাতুষ্পুত্রের সমস্ত বিষয় সম্পত্তি গ্রাস করিবার রীতিমত আয়োজন করিতেছেন, ইহা তারকের বুঝিতে বাকি রহিল না। বকধার্ম্মিক রামরামের গ্রাস হইতে রতনকে উদ্ধার করা দুরূহ ব্যাপার হইলেও, চেষ্টা করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া তারক কহিলেন, “তাই ভাবিতেছিলাম রামরাম, রতনকে কি করিয়া ফেরান যায় ! দেখ, তুমি যদি বল, তাহা হইলে আমি একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারি।

যতদূর জানি, আমার বিশ্বাস, সে আমার কথা ঠেলিবে না। দোষ দেখাইয়া দিলে সে দেখিতে জানে।"

রামরাম বিব্রত হইয়া পড়িলেন। ইহার উত্তর তিনি কি দিবেন? একজন যদি চেষ্টা করিতে চায়, কি বলিয়া তিনি বাধা প্রদান করিবেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন।

এমন সময় নরহরি বলিয়া উঠিলেন, "তুমিও যেমন তারক, নিজের খাইয়া কে পরের মহিষ তাড়াইতে যায়; খুড়া ভাইপোয় যাহা হয় করুক্, তুমি আমি কেন তাহাদের মাঝখানে দাঁড়াইতে যাই? রতন ত আর নাবালক নয়, বোকাও নয়, সে যদি জানিয়া শুনিয়া মদ খাইয়া নিজের সর্ব্বনাশ করিতে যায়, তুমি আমি কেন গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল হইতে চাই? এই ত শুনিলে রামরামের জামাই বাবাজীরা এখনই আসিতেছেন, তাঁহারা আসিয়া কি পরামর্শ দেন, দেখ; তাঁহাদের চেয়ে ত আর তুমি রতনের আপনার নও!"

রামরাম হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন, কহিলেন, "নরহরি, তুমিই ঠিক বলিয়াছ। দেখ তারক, তুমিও যে কিছু অন্যায় বলিয়াছ, তাহা নহে, তবে কি না জান, আমি এটা ইচ্ছা করি না যে, আমাদের এই ঘরের ব্যাপারের মধ্যে পরে আসিয়া হস্তক্ষেপ করে।"

তারক বাধা দিয়া কহিলেন, "বাস, চুকিয়া গেল হে রামরাম! তোমার যখন ইচ্ছা নয়, তখন আমিও আর এ সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে আসিব না। এতটা আগে ঠিক বুঝিতে পারি নাই। যাক্ ও কথা, আর এক কলিকা তামাক আনাও, টানিয়া উঠিয়া যাই।"

রামরাম হাসিতে হাসিতে তামাকের হুকুম করিলেন। এমন সময় রতনের বড় ভগিনীপতি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রামরাম মহাসমাদরে

তাঁহাকে গৃহাভ্যন্তরে লইয়া গেলেন। পাড়াপড়শীরা ধূম পান শেষ করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

২

রতনের ছোট ভগিনীপতি ভবেশচন্দ্র রামরামবাবুর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিয়া পত্নী সরোজিনীকে কহিলেন, "তোমার খুড়ামহাশয় কেন নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, জান ?"

সরোজিনী ব্যগ্র হইয়া কহিল, "কেন গো ? আমি ত সেই অবধি ভাবিতেছি, ব্যাপারখানা কি ; খুড়োমহাশয় যে হঠাৎ নিমন্ত্রণ করিলেন ?"

ভবেশ হাসিয়া কহিলেন, "নিমন্ত্রণ শুধু আমার নয়, তোমার আর দুই জামাইবাবুরও ছিল।"

সরোজিনী কহিল, "তাহা হইলে কিসের একটা যজ্ঞি ছিল নিশ্চয়, তা কই আমাদের ত খুড়োমহাশয় নিমন্ত্রণ করিলেন না। একবার দেখা হইলে তাঁহাকে এ কথা বলিতে হইবে। আমরা হইলাম পর ! আমাদের লইয়াই ত তোমাদের সহিত সম্বন্ধ. আর সেই আমরা পড়িলাম বাদ, আর তোমাদের হইল নিমন্ত্রণ, বেশ যাহা হউক।"

ভবেশ তেমনই হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "আমাদের সঙ্গে কাজ ছিল, তাই আমাদের খাতির যত্ন ; আবার তোমাদের যদি কোন দিন তাঁহার দরকার পড়ে, তোমাদেরও নিমন্ত্রণ হইবে।"

সরোজিনী কহিল, "যাক সে কথা, এখন রতনকে কেমন দেখে এলে বল ত ! সত্যিই কি সে বেহেঁট মাতাল হইয়াছে নাকি ?"

ভবেশ অপেক্ষাকৃত গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "দেখ ব্যাপার যাহা দেখিয়া আসিলাম, সে ভয়ানক।"

সরোজিনী ব্যস্ত হইয়া কহিল, "রতন ভাল আছে ত ?"

ভবেশ কহিলেন, "ভাল কি মন্দ আছে তাহা বুঝিব কি করিয়া। আমরা যখন সেখানে পৌছিলাম, তখন ত বেশী বেলা নহে, দেখিলাম তিন চারি জনকে লইয়া রতন মদ খাইতে বসিয়া গিয়াছে। আমাদের দেখিয়াও এতটুকু লজ্জাবোধ করিল না। আমাদের সামনেই মদ খাইতে লাগিল। তারপর সে কি চীৎকারের ঘটা, তোমায় আর কি বলিব!"

সরোজিনী আড়ষ্ট স্তব্ধ হইয়া স্বামীর কথাগুলি শুনিতেছিল। তাহার বুকের মধ্যে দ্রুত স্পন্দন হইতে লাগিল। আহা তাহাদের কত আদরের ছোট ভাই রতন, তাহার এই দুর্দ্দশা। সে প্রকাশ্যে কহিল, "হায় হায়, কে আমার ছোট ভাইয়ের এমন সর্ব্বনাশ করিল!"

ভবেশ গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "কে আবার কাহার সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে? তোমার ভাইটী ত আর কচিখোকা নহে, যে আর পাঁচজনে তাহার সর্ব্বনাশ করিবে? সে ইচ্ছা করিয়াই নিজের সর্ব্বনাশ করিতেছে। অবশ্য দুঃখ হয়, কিন্তু কোন মায়াদয়া হয় না। যাক্ সে কথা, রতনের যাহা খুসী সে তাহাই করুক্। আমার নিজের কাজ যথেষ্ট, পরের ভাবনা ভাবিবার আমার সময় নাই।"

সরোজিনীর চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। আজ যদি তাহার পিতামাতা বাঁচিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে কি তাহার আদরের ভাইটীর এমন সর্ব্বনাশ হয়। সে প্রকাশ্যে কহিল, "আমরা ছাড়া রতনের আর কে আছে?"

ভবেশ কহিলেন, "দেখ, সে বুঝিয়া সুজিয়া যখন এরূপ কাজ করিতেছে, তখন আমরা কি করিতে পারি। আমাদের নিজের ধান্দায় আমরা অস্থির, কে আর পরের খবর লইয়া বৃথা সময় নষ্ট করে। শোন ব্যাপারটা কি দাঁড়াইয়াছে, পাঁচ জন ইয়ার লইয়া মদ খাওয়া ত বিনা পয়সায় চলে না, জলের মত টাকারও দরকার হয়। তাই তোমার খুড়ো

মহাশয়ের কাছে শুনিয়া আসিলাম, রতন তাহার স্ত্রীর গহনা, বিষয়-সম্পত্তি, এমন কি দরকার হইলে বাড়ীর অর্দ্ধেক ভাগ পর্য্যন্ত বিক্রয় করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে।"

সরোজিনীর বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইল, "কি সর্ব্বনাশ, রতন একেবারে পথে বসিতে যাইতেছে!"

ভবেশ কহিলেন, "তাহার আর বড় দেরী নাই। স্ত্রীর গহনাগুলি সে বেচিবার জন্য হাতে করিয়া বসিয়া আছে, কেবল পারে নাই তোমার খুড়োমহাশয়ের জন্য।"

সরোজিনী আশান্বিত হইয়া কহিল, "তাহা হইলে খুড়ামহাশয় তাহাকে রক্ষা করিবেন।"

ভবেশ কহিলেন, "অত ব্যস্ত হইলে চলিবে কেন, সব কথা বলিতে দাও। গহনা ও বিষয়সম্বন্ধে কি করা যায়, তাহারই পরামর্শ করিবার জন্য তোমার খুড়োমহাশয় আমাদের ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা নয়, বাড়ীর বউয়ের গহনা পরের হাতে যায়।"

সরোজিনী বলিয়া উঠিল, "সে ত খুব ভাল কথা, সরলা আমার বাবার কত আদরের বউ। তাহার গহনা কেন পরের হাতে যাইবে।"

ভবেশ আর গম্ভীর হইয়া থাকিতে পারিলেন না, হাসিয়া ফেলিয়া কহিলেন, "না, তোমার সঙ্গে পারা গেল না। তোমার খুড়োমহাশয়ের বুদ্ধিশুদ্ধি তোমার মত প্রখর নয়। তাঁহার ইচ্ছাটা কি জান, গহনাগুলো তিনি জলের দরে কিনিয়া নিজের সিন্দুকে পুরিয়া রাখেন। পাছে আমরা পরে তাঁহাকে দোষ দিই, তাই আমাদের জানাইয়া এ কাজ করিবার মতলবে আমাদের নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন।"

সরোজিনীর পক্ষে একবারে মুখ বুজিয়া সমস্ত কথা শোনা অসম্ভব। সে কহিল, "তাহাতে তোমরা কি বলিলে?"

ভবেশ মুখের জোর করিয়া হাসি চাপিয়া সত্যই গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "সরল ও সাগরবাবু (ভবেশের ভায়রাভাইদ্বয়), দুইজনেই স্পষ্ট বলিলেন, তাঁহারা এ সব বিষয়ে কোন কথায় থাকিতে চান না ; রতনের যাহা ইচ্ছা হয়, সে করুক, খুড়োমহাশয়ও যাহা ভাল বোঝেন করুন। তাঁহারা আত্মীয়-কুটুম্বের বিষয়সম্পত্তি সম্বন্ধে ভালমন্দ কিছুই বলিতে চাহেন না।"

সরোজিনী বাধা দিয়া কহিল, "আর তুমি কি বলিলে?"

ভবেশ কহিলেন, "ও ছাড়া আমারই বা আর কি বলিবার আছে? তবে দেখ, আমার ইচ্ছা, গহনাগুলো আমিই রাখি, একেবারে আধা দামে পাওয়া যাইবে, এমন দাঁও ছাড়ি কেন? আমায় ত সবাই অর্থপিশাচ বলিয়াই জানে, আমার ত আর বদ্‌নামের কোন ভয় নাই। আমি স্থির করিয়াছি, এমন দাঁও ছাড়িব না। খুড়োমহাশয় লইলেও লইবেন, না হয় আমিই লইলাম। তোমার মতটা জানা দরকার, না হইলে কালই ও-কথা খুড়োমহাশয়কে জানাইয়া আসিতাম।"

সরোজিনীর মুখখানা এতটুকু হইয়া গেল। তাহার স্বামী যে সুবিধা পাইলেই এইরূপ দাঁও মত দ্রব্যাদি ও বিষয়সম্পত্তি কিনিয়া থাকেন, ইহা সে জানিত। তবে রতনের কোন দ্রব্যাদি যে তাহার স্বামী কিনিবেন, ইহা কিছুতেই হইতে পারে না। তাই প্রকাশ্যে কহিল, "না না, অমন কাজ তুমি করিও না, তাহা হইলে লোকের কাছে মুখ দেখাইতে পারিব না। তার চেয়ে তুমি এক কাজ কর, রতনকে ডাকিয়া পাঠাও, তাহাকে বুঝাইয়া বল, সে কিছুতেই তোমার কথা অমান্য করিবে না। তোমার কথা না শোনে, আমি তাহার হাত ধরিয়া কাঁদিয়া নিষেধ করিব ; তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই মদ ছাড়িয়া দিবে।"

ভবেশ কহিলেন, "সে হইবার নহে, তোমার খুড়োমহাশয় তাহাকে কিছুতেই এখানে আসিতে দিবেন না। তাহা ছাড়া আমারই বা অত

দরকার কি? আমি ত আর তোমার খুড়োমহাশয়ের মত তোমার ভাইয়ের বিষয়সম্পত্তি ফাঁকি দিয়া লইতে যাইতেছি না যে, আমি কাহারও কাছে মুখ দেখাইতে পারিব না। একজন যদি ইচ্ছা করিয়া জিনিষ বিক্রয় করে, তাহা কিনিতে আমি কোন দোষ দেখি না। আমার একটা অভ্যাস তা ত জান, সস্তায় জিনিষ পাইলেই আমি কিনিয়া ফেলি। তুমি যাই বল না, দাঁও পাইলে আমি কিছুতেই ছাড়ি না।"

সরোজিনী গাঢ়স্বরে কহিল, "দোহাই তোমার, তুমি উহার মধ্যে যাইও না; ও কাজ করিও না।"

ভবেশ একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন, "বিষয় সম্পত্তি টাকা কড়ি কি করিয়া করিতে হয়, তাহার যখন তুমি কোন ধার ধার না, তখন এ সব বিষয়ে কোন কথা বলা তোমার উচিত নহে। তোমাকে একথা জানানই দেখিতেছি অন্যায় হইয়াছে, তুমি গোলমাল করিয়া সব মাটী করিয়া না দাও।"

সরোজিনী স্বামীর দুইটী হাত ধরিয়া কহিল, "আমার মাথার দিব্য, তুমি ও কাজে যাইও না, সকলে ছি ছি করিবে। রতন, সরলা, দিদিরা সবাই মনে করিবে, তোমারই জন্য রতন পথে বসিয়াছে। সত্য বলিতেছি আমি তাহা হইলে বিষ খাইয়া মরিব।"

ভবেশ বিরক্তি প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "দেখ মিথ্যামিথ্যি গোল বাধাইও না। বিষয় সম্পত্তি করিতে গেলে অত চক্ষুলজ্জা করা চলে না। চক্ষুলজ্জা করিতে গেলে অনেক সময় ঠকিতে হয়। তুমি জানই ত আমায়, ঠকিতে আমি কিছুতেই রাজি নই। থাক্‌গে, তোমার সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শের কোন দরকার নাই—আমি যাহা ভাল বুঝিব তাহা করিব। ও সব দিব্য-টিব্যের আমি কোন ধার ধারি না।"

সরোজিনী আর কিছু বলিল না। অঞ্চলে চক্ষু ঢাকিয়া কাঁদিতে

লাগিল এবং বার বার ভগবান্‌কে ডাকিয়া বলিতে লাগিল, তাহার স্বামীর এ মতিগতি ফিরাইয়া দাও ঠাকুর! ভবেশও খানিক [illegible] নীরবে দণ্ডায়মান থাকিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

৩

এই ব্যাপারের পর প্রায় মাসখানেক অতিবাহিত হইয়া গিয়া[illegible] মদের নেশা দিন দিন বাড়িয়াছে বই কমে নাই। এই অ[illegible] একে একে তাহার পত্নীর সব কয়খানি গহনা এবং বিষয়-সম্পত্তি আধা-কড়িতে বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছে। বাস্তভিটাটী পর্য্যন্ত সে বিক্রয় করিতে উদ্যত হইয়াছে। মদ তাহাকে এমনই উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছে যে, তাহার প্রকৃত বন্ধুবান্ধব হিতৈষী আত্মীয়-কুটুম্ব কাহারও কথা সে কাণে তুলিতেছে না। যে কেহ তাহাকে বুঝাইতে আসিয়াছে, তাহাকেই সে কটুকথা বলিয়া গালিগালাজ করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে। কিছুদিন হইতে একটী নূতন যুবক আসিয়া তাহার নেশার সঙ্গী হইয়াছে এবং ক্রমে ক্রমে তাহার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। তাহারই কথায় রতন এখন চালিত হয়। কাজেই খুল্লতাত রামরামবাবু তাঁহার সে দুই তিন জন চরিত্রহীন শ্যালকের সাহায্যে রতনকে মদ ধরাইয়া তাহার টাকাকড়ি ও বিষয় সম্পত্তি গ্রাস করিবার আয়োজন করিয়াছিলেন, এই নূতন সঙ্গীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সে সমস্ত আয়োজনই ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। তিনি নিষ্ফল আক্রোশে মনে মনে ফুলিতে থাকিলেও কিছুই করিতে পারিলেন না। রতনের সেই নূতন সঙ্গীটীর সহিত কিছুতেই আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না। রতনের স্ত্রীর সমস্ত অলঙ্কার ও বিষয়-সম্পত্তি একে একে তাহারই হাতে গিয়া পড়িল। তারপর গোপনে গোপনে কবে যে রতন তাহার নিকট বাটীর অংশ অবধি বিক্রয় করিয়া ফেলিল, তাহাও তিনি

জানিতে পারিলেন না। তিনি মনে মনে স্থির করিতেছিলেন, বিষয় সম্পত্তি যখন দখল লইতে আসিবে, তখন একবার দেখিয়া লইবেন, কাহার দেহে কয়টা মাথা আছে। তাঁহার প্রাণ থাকিতে তিনি কাহাকেও বিষয়ের অংশ দখল করিতে দিবেন না। বিষয় ফাঁকি দিয়া কেনা সহজ, কিন্তু দখল করা তত সহজ নহে। যাহা হউক, সে সম্বন্ধে সময়মত ব্যবস্থা করিবার সঙ্কল্প করিয়া বাস্তভিটার অংশ কি করিয়া যৎকিঞ্চিৎ মূল্যে হাত করিতে পারেন, তাহারই ফন্দি আঁটিতে লাগিলেন।

এদিকে হাতের কড়ি যখন ফুরাইয়া গেল, রতনের বন্ধুবান্ধবেরা একে একে গা ঢাকা দিল। প্রতিদিন রতনের বাহিরের ঘর আট দশ জন বন্ধুতে পরিপূর্ণ থাকিত। এক দিন প্রাতঃকালে নিদ্রা হইতে জাগিয়া রতন দেখিল, তাহার সেই কক্ষ শূন্য। সে বন্ধুগণের জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া রহিল, কিন্তু কেহ আসিল না। ক্রমে ক্রমে সে অস্থির হইয়া উঠিল, মদের জন্য তাহার প্রাণ ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। ঘরের ভিতর এ কোণে সে কোণে সে মদের অনুসন্ধান করিয়া ফিরিল, কিন্তু কোথাও একটুকু মদ পাইল না। বোতলগুলি সমস্তই শূন্য পড়িয়া আছে। সে কক্ষের মধ্যে তিষ্ঠিতে পারিল না, বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। আজ তিন চারি মাস সে এই অসীম সৌন্দর্য্যময় জগতের দিকে একবার ফিরিয়াও দেখে নাই; সে যে জগতে বিচরণ করিয়াছে, তাহা এই জগত হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তাই বহুদিন পরে সে একবার নূতন করিয়া সেই পুরাতন জগতের পানে চাহিয়া দেখিল। দারুণ পিপাসায় তাহার কণ্ঠনালী শুষ্ক হইয়া আসিতেছিল। তাই সে ভাল করিয়া সে সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে পারিল না। মদের দোকানের দিকে সে ছুটিয়া গেল। দোকানে প্রবেশ করিয়া শুষ্ককণ্ঠে কহিল, "সাধুদা একটা বোতল দাও।"

সাধু সাহা হাত জোর করিয়া কহিল, "ছোটবাবু মাপ করিতে হইবে;

আর মদ আমি দিতে পারিব না। আপনার নিকট আমার অনেক পাওনা হইয়া গিয়াছে। শুনিলাম আপনি বাড়ী পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছেন। আপনাকে আমি আর কোন্ ভরসায় মদ ধারে বেচিব। যাহা দিয়াছি, তাহার ত আর কোন উপায় নাই, আর আমি ক্ষতি স্বীকার করিতে পারিব না।"

রতন অনেক কাকুতি-মিনতি করিল, কিন্তু সাধু সাহা কিছুতেই তাহাকে ধারে মদ বেচিল্ না। অগত্যা নিরুপায় হইয়া টাকার সন্ধানে রতন গৃহে ফিরিল, ভিতরে প্রবেশ করিয়াই সে নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। তাহার মনে হইল, এ যেন সে গৃহ নহে। সে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল, তাহাদেরই বাড়ী বটে, কিন্তু এ বাড়ীর উপর দিয়া যেন সহস্র ভূতপ্রেত নৃত্য করিয়া সমস্ত তচনচ করিয়া গিয়াছে। রতন দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া খানিকক্ষণ সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল; তারপর ভগ্নকণ্ঠে ডাকিল, "সরলা, সরলা!"

একটী ষোড়শী যুবতী ছিন্নগ্রন্থিযুক্ত অপরিচ্ছন্ন বস্ত্রে সারা দেহ ঢাকিয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। রতন নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ হইয়া সেই মুর্ত্তির দিকে চাহিয়া কাঠের পুতুলের মত সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রতনের একে একে সব কথা মনে পড়িল। গৃহের অবস্থা ও পত্নীর দুর্দ্দশা যেন আজ চোখে আঙ্গুল দিয়া অতীতের সমস্ত ঘটনাগুলি তাহাকে দেখাইয়া দিল। তাহার মনে পড়িল, সে নিজেই নিজের এই সর্ব্বনাশ করিয়াছে। পরের সামান্য দুঃখ দেখিয়া যাহার কোমল হৃদয় গলিয়া যাইত, চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইত, আজ সম্মুখে পত্নীর এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া সে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সরলাও নীরবে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। সে দুঃখীর মেয়ে, বিবাহের পূর্ব্ব অবধি সে পিতামাতাকে কেবল কাঁদিতে দেখিয়াছে, বড় হইয়া সে নিজেও তাঁহাদের

সহিত কাঁদিয়াছে; তারপর ভগবানের আশীর্ব্বাদে সে রাজরাণী হইয়াছিল; আবার দুরদৃষ্ট তাহাকে এই অবস্থায় আনিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু কষ্ট সহ্য করিতে সে শিশুকাল হইতেই অভ্যস্ত, তাহার নিজের জন্য সে কাঁদে নাই। সে কাঁদিতেছিল, তাহার স্বামীর জন্য। তাঁহার যে দারিদ্র্য-দুঃখ সহ্য করিবার অভ্যাস নাই। হায় ঈশ্বর! একি করিলে, আজ যে ঘরে এক মুঠা চাল পর্য্যন্ত নাই!

এমন সময় রতন উন্মত্তের মত বলিয়া উঠিল, "সরলা কয়দিন খাইতে পাও নি?"

সরলা চোখের জল মুছিয়া কহিল, "ছোট দিদিমণি (রতনের ছোট-দিদি সরোজিনীকে সরলা ছোট দিদিমণি বলিয়া ডাকিত) রোজ তাঁহাদের ঝিকে দিয়া লুকাইয়া চাল ডাল সব পাঠাইয়া দিয়াছেন, তাহাতে তোমার আমার খাওয়ার কোন অভাব হয় নাই। কিন্তু"—হঠাৎ সরলা থামিয়া গেল। প্রতিদিন খুব ভোরে সরোজিনী দাসীকে দিয়া দুইবেলার মত চাল ডাল পাঠাইয়া দিয়াছে, আজ ভোরে দাসী আসিয়া জানাইয়া গিয়াছে যে, সে প্রতিদিনের মত আজও দ্রব্যাদি আনিতেছিল, এমন সময় ভবেশবাবুর সাম্‌নে পড়িয়া যাওয়ায় তিনি সমস্ত কথা জানিতে পারিয়াছেন এবং কড়া হুকুম দিয়াছেন যে, ভবিষ্যতে যেন তাঁহার গৃহ হইতে এক কণা চাল না বাহিরে যায়।

রতন তাহাকে নীরব হইতে দেখিয়া কহিল, "আজ বুঝি ঝি আসে নাই; নাই আসিল তাহার জন্য ভাবনা কি, খুড়ামহাশয় আমাদের পৃথক্ করিয়া দিয়াছেন বলিয়া কি দুই মুটা খাইতে দিবেন না। আমি মাতাল হইয়া সব খোয়াইয়াছি। এখন খুড়ামহাশয়ের কাছে গিয়া পড়া ছাড়া আর উপায় কি?"

সরলা কিছু বলিল না। সে স্বামীর অনুসরণ করিল। রতনকে

দেখিয়া খুড়োমহাশয় কহিলেন, "যাহা হউক, খুড়োমহাশয়কে যে এতদিন পরে মনে পড়িয়াছে ইহাই সৌভাগ্য। তোমার বিষয় সম্পত্তি রক্ষা করিবার চেষ্টায় আমি এমনই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, তোমাদের খবর অবধি লইতে পারি নাই। আহা, বউমার এমন দুর্দ্দশা হইয়াছে, আমি যে ইহা ভাবিতেও পারি নাই। বউমা এখানে থাকুন, চল আমরা বাহিরে গিয়ে বসিগে। ওগো, বউমাকে একখানা নূতন কাপড় বাহির করিয়া দাও ত। আহা, আমরা থাকিতে তিনি এমন ছেঁড়া নেক্‌ড়া পরিয়া থাকিবেন! তাহা হইতে পারে না। হরি হে তুমিই সত্য।"

৪

রতনকে লইয়া রামরামবাবু বাহিরে আসিয়া বসিলেন। [illegible] যন্ত্রণায় রতনের সারা অন্তর দলিত ও পিষ্ট হইতে লাগিল। সে [illegible] অপরাধীর মত মুখ হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল। রামরামবাবু কিছুক্ষণ নীরবে থাকিবার পর কহিলেন, "কিছু ভাবিও না বাবা, আমি থাকিতে তোমার বিষয়সম্পত্তি কেহ দখল করিতে পারিবে না। তোমায় মদ খাওয়াইয়া ফাঁকি দিয়া সামান্য টাকায় বিষয় সম্পত্তি লিখাইয়া লইয়া বেটা ভাবিয়াছে বড় দাঁও মারিলাম! বেটা জানে না রামরাম দত্ত এখনও বাঁচিয়া আছে, মরে নাই। শুনিলাম কাল রাত হইতে সব বেটারা নাকি তোমার আড্‌ডা ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছে। ভালই হইয়াছে, যাহা করেন হরি মঙ্গলের জন্য। পাঁচজনে পড়িয়া কি মদটাই না তোমায় খাওয়াইত! যাক্, খবর লইয়া জানিলাম, তুমিও কাল হইতে মদ ছাড়িয়া দিয়াছ। কিন্তু দেখ, আমি তোমার কাকা, আমার মুখে অবশ্য সে কথা বলা শোভা পায় না, তবে বলা উচিত, তাই বলিতেছি, অত খাওয়ার পর

হঠাৎ মদ একেবারে ছাড়িয়া দিলে একটা শক্ত ব্যায়রাম হইতে পারে। আমার মতে—"

রতন এতক্ষণ নীরবে খুড়োমহাশয়ের সমস্ত কথাগুলি শুনিয়া যাইতেছিল, এইবার বাধা দিয়া কহিল, "না কাকা, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, মদ আর স্পর্শ করিব না। শক্ত ব্যায়রামে ভুগিব তাহাও স্বীকার, তবু ও-পথে আর যাইব না।"

রামরামবাবু কি বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় একজন পাইক আসিয়া উভয়কে অভিবাদন করিল।

রামরামবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি চাই?"

পাইক সসম্ভ্রমে কহিল, "রতনবাবুর নামে পরওয়ানা আছে।"

রামরামবাবু কহিলেন, "দেখি কিসের পরওয়ানা?"

পাইক পরওয়ানাখানি রামরামবাবুর হাতে দিলে তিনি পরওয়ানার নীচে স্বাক্ষর দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন। একি! ইহা যে তিনি কল্পনায়ও আনিতে পারেন নাই। ভবেশের এত কারসাজি! তাঁহার মুখের গ্রাস সে এমনই ভাবে কাড়িয়া লইবে! তিনি যথাসম্ভব মনের চাঞ্চল্য দমন করিয়া কাগজখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেন। পাঠ শেষ হইবার পর তিনি খানিকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। যে জন্য তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রকে এত খাতির যত্ন করিতেছিলেন, তাহাও যে অপরের হাতে চলিয়া গিয়াছে। এখন উপায় কি? হঠাৎ তাঁহার একটা কথা মনে পড়িতেই তিনি অনেকটা সুস্থ হইলেন। পাইককে কহিলেন, "আচ্ছা তুমি যাইতে পার।"

পাইক কহিল, "বাবু উত্তর চাহিয়াছেন।"

রামরামবাবু উষ্ণ হইয়া কহিলেন, "তোর বাবুকে বলিস্—উত্তর এখানে আসিলে পাইবেন।"

পাইক অভিবাদন করিয়া কহিল, "যে আজ্ঞে!" তারপর কাপড়ের খুঁট হইতে একখানি পত্র খুলিয়া রামরামবাবুর হাতে দিয়া কহিল, "বউঠাকরুণ রতনবাবুকে দিয়াছেন।" এই কথা বলিয়া কোন উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়া সে চলিয়া গেল।

রতন কিছু বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে চিঠি লিখিয়াছে কাকা? পরওয়ানা বা কিসের?"

রামরামবাবু পত্রখানি পড়িতে পড়িতে মুখ না তুলিয়াই কহিলেন, "সংসারে লোক চেনাই দায়, আত্মীয়স্বজনের মত মানুষের আর বড় শত্রু নাই। ভবেশ কিনা বেনামী করিয়া সমস্ত বিষয়সম্পত্তি ফাঁকি দিয়া লইয়াছে। জামাই বলিয়া মনে করিয়াছে রেহাই পাইবে। কিন্তু সে কিছুতেই হইতেছে না।" ততক্ষণে তাঁহার পত্র পড়া শেষ হইয়া গেল। তিনি পত্রখানি রতনের হাতে দিলেন।

পত্রখানি সরোজিনীর। সে লিখিয়াছে, "ভাই, তুমি এতক্ষণ সব কথাই জানিতে পারিয়াছ, আমি কাঁদিয়া কাটিয়া হাতে পায়ে ধরিয়া তাঁহাকে এ সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে বারবার বলিয়াছি, কিন্তু তিনি কোন কথা শুনিলেন না। আমার দুঃখ রাখিবার জায়গা নাই, আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে। আমার একটা অনুরোধ রাখিও, অপমান হইয়া বাড়ী ছাড়িবার পূর্ব্বেই তুমি সরলাকে লইয়া মেজদিদির ওখানে উঠিও। ভাই, তোমায় মিনতি করিয়া বলিতেছি, ও ছাই মদ ছাড়িয়া দাও। লক্ষ্মী ভাইটী আমার, মদ আর খাইও না। ইতি, তোমার দুঃখিনী ছোটদি।"

রতনের পত্র পড়া শেষ হইলে, রামরামবাবু কহিলেন, পরওয়ানা পাঠাইয়া তোমার ভগিনীপতি জানাইয়াছেন, সমস্ত বিষয় সম্পত্তি ও বাড়ী ছাড়িবার জন্য দলিলে যে সময়ের কথা ছিল, সে সময় উত্তীর্ণ হইয়া আরও সাত দিন চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু তুমি এখনও কিছু ব্যবস্থা করিলে

না। তাই বাধ্য হইয়া আমাকে জোর করিয়া দখল করিতে হইবে। আরও তিন দিন সময় দিলাম। নিশ্চিত জানিবে—তৃতীয় দিবস অপরাহ্ণে আমি লোকজন লইয়া দখল করিব। ওদিকে আবার সরোজিনীকে দিয়া লেখান হইয়াছে,—অপমান করিবে। চেনে না ত কাহার ভাইপোকে অপমানের কথা লিখিয়াছে, একবার লাঠিয়ালের বহরটা দেখাইয়া দিব। দেখ রতন,তুমি এক কাজ কর। আমি গ্রামের আরও পাঁচজন ডাকিতেছি, তুমি তাহাদের সম্মুখে ভবেশকে লিখিয়া দাও—সে যে টাকা দিয়া বিষয় সম্পত্তি বাড়ী গহনা ইত্যাদি কিনিয়া লইয়াছে, আমি সুদ-সমেত তাহা চুকাইয়া দিতেছি। বুঝিলে বাবা, আমার থাকিলেই তোমার থাকিবে। ভাল কথায় রাজী না হয়, শেষে তাহার ব্যবস্থা করা যাইবে। তুমি কিছু ভাবিও না বাবা; আর দেখ, বউমাকে কোথাও পাঠাইবার আবশ্যক নাই। আমি বাঁচিয়া থাকিতে তিনি কোন্ দুঃখে পরের বাড়ীতে গিয়া উঠিবেন!"

রামরামবাবুর ব্যবস্থা মতই রতন পাঁচজন প্রতিবাসীর সম্মুখে ভবেশকে পত্র লিখিয়া পাঠাইল। যথাসময়ে পত্রের উত্তর আসিল। ভবেশ লিখিয়াছেন, "আমি বিষয় সম্পত্তি কিছুই ছাড়িব না। সব সময় এরূপ সুবিধা জোটে না। তুমি ত তখন আর একজনকে বেচিতেই, সে ত আর ফিরাইয়া দিত না। তখন আমিই বা কেন দিব? নিজের স্বার্থ সকলেই অনুসন্ধান করে। আমাকে বৃথা অনুরোধ করিও না। টাকার সম্পর্কে কোন অনুরোধ আমি কাহারও রাখি না, এমন কি তোমার ভগিনীর পর্য্যন্ত নহে। আমি তোমায় জানাইয়া রাখিতেছি, কাহারও কুপরামর্শে আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াইও না। খুড়োমহাশয়কে নমস্কার জানাইয়া বলিও, তাঁহার উত্তর শুনিয়াছি। তিনি যেন ভাল করিয়া জানিয়া রাখেন, আমিও সোজা লোক নহি, বিষয়সম্পত্তি আমি নূতন কিনিতেছি না। দাঙ্গা

হাঙ্গামা করিতেও আমি অনভ্যস্ত নহি। আর এই কথাটি তাঁহাকে বুঝাইয়া দিও যে, তাঁহার মুখের গ্রাস এইভাবে যে কাড়িয়া লইতে পারিয়াছে, সে কম লোক নহে। ইতি ভবেশ। পুনশ্চ, আমার যে কথা, সেই কাজ, যে তারিখে লিখিয়াছি, সেই তারিখে যেভাবে পারি—দখল করিব।"

রামরামবাবু পত্রখানি পড়িয়া গর্জ্জিতে লাগিলেন। এ সম্বন্ধে অতঃপর কি করা যায়, তিনি প্রতিবাসীদের লইয়া, তাহার পরামর্শ আঁটিতে বসিলেন। তিনি বড় গলা করিয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখিলে জামাইবাবাজীর স্পর্দ্ধা, আমাকে লক্ষ্য করিয়া কিনা অত বড় কথা লেখে! রতন টাকা ফেরত দিতে চাহিয়া অনুনয়বিনয় করিয়া পত্র লিখিল, আর তার কিনা এই উত্তর! ইহার প্রতিশোধ চাই-ই।"

গ্রামের অনেকেই রামরামবাবুর পক্ষ সমর্থন করিলেন। ভবেশের কুটিল আচরণে সকলেই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। কলহ বাধাইবার জন্য যাঁহারা সর্ব্বদা সুযোগ অনুসন্ধান করিয়া বেড়ান, তাঁহারা এ সুযোগ কি ছাড়িতে পারেন!

ভবেশও বাড়ী বসিয়া সমস্ত সংবাদ পাইলেন, সরোজিনীও শুনিল, তাহার খুড়োমহাশয় বহু লাঠিয়াল সংগ্রহ করিতেছেন, বিষয় সম্পত্তি লইয়া একটা খুনাখুনি না হইয়া যায় না। সরোজিনী স্বামীর পায়ের উপর পড়িয়া কাঁদিয়া কহিল, আমার মাথার দিব্য, তুমি ও গ্রামে যাইও না।" ভবেশ ভয় পাইবার পাত্র নহেন। বয়সে তিনি প্রবীণ না হইলেও, তিনি পাকা বিষয়ী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি পত্নীকে পায়ের উপর হইতে তুলিয়া কহিলেন, "তোমাদের যাহা কাজ, তাহাই কর। বাহিরে কোথায় কি হইতেছে, তাহাতে তোমার কাণ দিবার দরকার কি? শোন, ব্যস্ত হইও না, তোমার খুড়োমহাশয় যতই কেন লোক সংগ্রহ করুন না,

আমার তিনি কিছুই করিতে পারিবেন না। তুমি নিশ্চিন্ত থাক, মিথ্যা-মিথ্যি কাঁদাকাটি করিও না। বিষয় সম্পত্তি করিতে গেলে, এমন বিপদ মাঝে মাঝে প্রায়ই আসে, তাহাতে ভয় পাইলে চলিবে কেন?"

সরোজিনী আর কিছু বলিল না। শুষ্কমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। তবুও আরও একবার সে কান্নাকাটি করিল, কিন্তু কিছুতেই ভবেশকে নিরস্ত করিতে পারিল না।

তখন বেলা প্রায় পাঁচটা। সন্ধ্যা হয়-হয় হইয়াছে। সূর্য্যকিরণের তীক্ষ্ণতা একেবারেই কমিয়া আসিয়াছে। সূর্য্যদেব তাঁহার সমস্ত কিরণ-রশ্মি সংযত করিয়া ধীর শান্ত ভাবে হাসি মুখে পৃথিবীর নিকট হইতে সে দিনকার মত বিদায় লইবার আয়োজন করিতেছিলেন।

রামরামবাবুর বাটীর প্রাঙ্গণে বহু লাঠিয়াল আসিয়া জমা হইয়াছে। আর একদল লাঠিয়াল সঙ্গে করিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র তাঁহাদের এক কাছারী বাড়ীতে চলিয়া গিয়াছে। প্রতিবাসীরা আসিয়া রামরামবাবুর বাহিরের ঘর জমকাইয়া বসিয়াছেন। রতন মুখখানি এতটুকু করিয়া সেই ঘরের এক কোণে বসিয়া আছে। প্রতি মুহূর্ত্তে সকলেই প্রতীক্ষা করি-তেছে, ভবেশ লাঠিয়াল লইয়া উপস্থিত হইল বলিয়া। ঐ বুঝি দূরে ভবে-শের লাঠিয়ালগণ হুঙ্কার দিতেছে। রামরামবাবু হাঁকিলেন, "হুসিয়ার।" তাঁহার ইঙ্গিতে তাঁহার লাঠিয়ালগণও প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল। এমন সময় অদূরে পাল্কী বেহারার "হাইও-হুইও" রব স্পষ্ট শুনা গেল। দেখিতে দেখিতে একখানি পাল্কী আসিয়া প্রাঙ্গণের মধ্যে প্রবেশ করিল। সঙ্গে মাত্র একজন লোক। পাল্কীর দ্বার রুদ্ধ।

রামরামবাবু অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাহার পাল্কী?"

পাইক অভিবাদন করিয়া কহিল; "ভবেশবাবুর!"

রামরামবাবু ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "তা এখানে কেন?"

পাইক সসম্ভ্রমে কহিল, "আজ্ঞে, এই ত তাঁহার শ্বশুরবাড়ী ?"

রামরামবাবু আরও চটিয়া উঠিয়া কহিলেন, "হাঁ, তা পাল্কীতে কে ? এ শ্বশুরবাড়ীর সঙ্গে সে নেমকহারামটার কোন—"

তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতে ভবেশ একখানি ছড়ি হস্তে সহাস্যমুখে প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সকলে সবিস্ময়ে দেখিল, ভবেশের সঙ্গে একজন লাঠিয়ালও নাই। তিনি অগ্রসর হইয়া রামরামবাবুকে নমস্কার করিয়া কহিলেন, "খুড়োমহাশয় আমি নেমকহারাম নই, নেমকহারাম যে কে, সে কথা আর মুখ ফুটিয়া বলিতে চাহি না। আপনি যে ভাবে আপনার নিরীহ ভাইপোটীর সর্ব্বনাশ করবার জন্য জাল ফেলিয়াছিলেন, এ পথ ছাড়া সে জাল ছিন্ন করিবার অন্য কোন উপায় ছিল না। আমি রতনের সম্পত্তি রক্ষা করিতেই আসিয়াছি, দখল করিতে আসি নাই। আপনি হাজার লাঠিয়াল সংগ্রহ করিলেও রতনের সামান্য এতটুকু জমি ফাঁকি দিয়া লইতে পারিবেন না।" তারপর রতনের হাত ধরিয়া নিকটে টানিয়া আনিয়া কহিলেন, "চল্ ভাই, তোর ছোড়্‌দি তোর জন্য অস্থির হইয়া আছে। সরলা কোথায়, তাকে লইবার জন্য তোর দিদি যে ঐ পাল্কী পাঠাইয়াছে। যা, দেরী করিস্ না। আহা সে বেচারী কি কষ্টই না পাইয়াছে!"

সূর্য্যদেব পশ্চিম কোণে হেলিয়া রামরামের দুরবস্থা দেখিয়া হাসিতে হাসিতে আরও লাল হইয়া উঠিলেন।

—
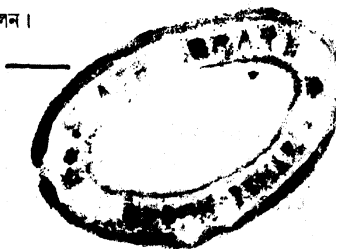
নিতাই

নিতাই ঘোষ কম্পোজিটারের কাজ করিত। সকাল ছয়টা হইতে রাত্রি নয়টা অবধি খাটিয়া সে বাইশটি টাকা রোজগার করিত। তাহাও সে কোনমাসে এক সঙ্গে পাইত না। তাহার মনিব নিজেদের সুবিধা ও অবসর মত লোকজনদের মাহিনা দিতেন। তাই নিতাইয়ের বড় কষ্ট। কেননা অধিকাংশ কম্পোজিটাররা যেমন হোটেলে খাইয়া যেখানে সেখানে রাত কাটাইয়া দিনের পাপ ক্ষয় করিত, নিতাইয়ের তাহা করিবার উপায়ও ছিল না, ইচ্ছাও ছিল না। নিতাইয়ের পত্নী ও দুই বৎসরের শিশুপুত্রটি তাহার সমকর্ম্মী অধিকাংশ কম্পোজিটার হইতে তাহার জীবনযাপনের ধারাটাকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন পথে পরিচালিত করিয়াছিল। এই দুইটি প্রাণীর আশ্রয়ের জন্য নিতাইকে চারি টাকায় একখানি খোলার-ঘর ভাড়া করিতে হইয়াছিল।

এতদিন প্রত্যহ কাজ সারিয়া, দুই ঘণ্টা ধন্না দিয়া মনিবের হাতে পায়ে ধরিয়া সে প্রতিদিন অন্ততঃ আট আনাও লইয়া আসিত; তাহাতে কোন রকমে দুমুটো ডালভাতের সংস্থান হইত, কিন্তু সে দিন তাহাও

মিলিল না। সে সন্ধ্যার সময় শুষ্কমুখে শ্রান্তদেহে রিক্তহস্তে বাটী ফিরিয়া আসিল। সেদিন মাস শেষ হইয়া কুড়ি দিন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল,রোজের আট আনা ছাড়া, আরও তিন চার টাকা পাইবার কথা ছিল, কিন্তু টাকার কথা বলিতেই তাহার মনিব বলিলেন, "আজ কিছু হবেটবে না।"

নিতাই শিহরিয়া উঠিয়া বলিল, "সেকি বাবু!"

তাহার মনিব হরলালবাবু সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া খাজাঞ্চির সহিত টাকার হিসাবে মনঃসংযোগ করিলেন।

নিতাই প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা চুপ করিয়া সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কাতর-কণ্ঠে কহিল, "বাবু গরীবের একটা উপায় করুন।"

হরলালবাবু হিসাবের খাতা হইতে মুখ না তুলিয়া বলিলেন,—"আজ হ'বে না হে বাপু।"

নিতাই অনন্যোপায় হইয়া কহিল,—"তা হলে টাকা কটা কাল পাব ত বাবু?"

হরলালবাবু সেই ভাবেই উত্তর করিলেন "তা দেখা যাবে'খন।"

নিতাই কহিল,—"দেখা যাবে কি বাবু কাল আমার চাই-ই, না হ'লে কিছুতেই চলবে না। তা সবটা না হয় কাল দেবেন, আজ আমায় একটা টাকা দিন বাবু।"

হরলাল হাসিয়া বলিলেন,—"এক টাকা! হা—হা—হা, আজ তোমার এক পয়সাও মিলবে না, তোমাকে ত রোজই দিচ্ছি, হরি অনেক-দিন পায়নি, আজ তাকে না দিলেই নয়।"

নিতাইয়ের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে খানিকক্ষণ নিরুত্তর হইয়া রহিল। এই আট আনার উপর যে তাহাদের সমস্ত নির্ভর করে! সে জোড়হাত করিয়া কাতরকণ্ঠে কহিল,—"তা হ'লে না খেয়ে যে থাকতে হবে বাবু!"

হরলাল আবার হা-হা করিয়া উচ্চ হাসিয়া কহিলেন,—"এ রাতটা না হয় উপোস ক'রে কাটিয়ে দাও গে।"

মনিবের এই হাসি তাহার হৃদয়ে বিষম বাজিল। তাহা কোন রকমে সাম্‌লাইয়া লইয়া সে আবার কাঁদকাঁদ হইয়া কহিল,—আমরা না হয় উপোস ক'রে থাক্‌ব, আমার যে ছোট একটি ছেলে আছে, তাকে ত বাবু কিছু খাওয়াতে হবে।"

হরলাল এবার গম্ভীর হইয়া কহিলেন,—"আমার এখন ঢের কাজ, তোমার অত কথা শোন্‌বার আমার সময় নেই,—তুমি খেতে পাও আর না পাও, আজ কিছুই পাবে না।"

তবুও নিতাই অনেক কান্নাকাটি করিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। আজ তাহার মনিব হরলালের যে কথা সেই কাজ!

নিতাইয়ের নিকট সেদিন মাত্র চারিটি পয়সা ছিল। রাত্রের জল-পানির জন্য এইমাত্র সে ঐ চারিটি পয়সা পাইয়াছিল। সে রাত্রি সে ও তাহার পত্নী এক পয়সার মুড়ি খাইয়া কাটাইয়া দিল। বাকি তিন পয়সার কিছু কিনিয়া আনিয়া পুত্রকে খাওয়াইল এবং পর দিনের ব্যবস্থা, অসহায়ের সহায়—অসময়ের একমাত্র আশ্রয়—দীনের বন্ধু—ভগবানের হাতে সঁপিয়া দিয়া সে নিদ্রার কোলে সান্ত্বনা লাভের চেষ্টা করিতে লাগিল। মানুষ যখন একেবারে নিরুপায় হয়, তখনই ভগবানের কাছে ছুটিয়া যায়!

কি করিয়া এ শ্রেণীর লোক পুত্র-পরিবারের অন্ন যোগাইয়া থাকে, তাহা অন্য লোকে কল্পনাও করিতে পারে না। কিন্তু যে ভাবেই হউক, খাইয়া না খাইয়াও শীর্ণজীর্ণদেহে তাহারা বাঁচিয়া থাকিয়া ভগবানের অস্তিত্বের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। কেহ ভগবান্‌কে গালি পাড়ে, কেহ পূর্ব্বজন্মের দুষ্কৃত কার্য্যের ফল ভাবিয়া ভগবানের দোষ না দিয়া নীরবে সমস্ত সহ্য করিয়া যায়।

এই দ্বিতীয় শ্রেণীর জীব—নিতাইয়ের দিন আর কিছুতে চলিতে চাহিতেছিল না। দশ দিন সে আপিস হইতে এক কপর্দ্দকও পায় নাই। কিন্তু তাহার কাজের কামাই ছিল না। প্রতিদিন সে যথানিয়মে কাজ করিয়া যাইত। কিন্তু আর যে চলে না! একথা সে বার বার মনিবকে জানাইয়াছে, মনিবের মন তাহাতে একটুও নরম হয় নাই।

সে দিন রাত্রে তাহার পত্নী কহিল,—"ছাই অমন কাজ না ক'রলে নয়, সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খেটে আসবে, তবু পেটে দুটো ভাত জুটবে না —অমন কাজের মুখে আগুন।"

নিতাই দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—"ওখানে আর মায়া ক'রে পড়ে থাকলে চলবে না, কাল যাহ'ক একটা বোঝা-পড়া করে কাজ ছেড়ে দেব।"

পরদিন নিতাই তাহার মনিবকে টাকার কথা বলিলে, তিনি অগ্নিশর্ম্মা হইয়া কহিলেন,—"কাজের সঙ্গে নেই খোঁজ—কেবল টাকা আর টাকা, —যত ফাঁকিদার লোক এসে জুটেছে এখানে।"

নিতাই আশ্চর্য্য হইয়া কহিল,—"সে কি বাবু, না খেয়ে প্রাণপণে খাট্‌ছি, তবু বলছেন ফাঁকিদার!"

হরলাল আরও চটিয়া উঠিয়া কহিলেন,—"ফাঁকিদার না ত কি? তোমরা সবাই মনে করেছ, আমি নাকে তেল দিয়ে ঘুমোই, কে কি কর কিছু বুঝিনি! কাজের হিসাব না নিয়ে কাউকেও এক পয়সা দেব না।"

নিতাইয়ের অবস্থাও দুর্দ্দশার চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। সে কহিল,—"আপনি কাজের হিসেব করবেন, আর আমরা না খেয়ে থাক্‌ব, বেশ কথা যা হ'ক!"

হরলাল হঠাৎ মহা চীৎকার করিয়া উঠিয়া কহিলেন,—"নেমকহারাম! তোকে হাতে ধরে কাজ শেখালাম, আর তুই কিনা আমার মুখের উপর এত বড় কথা বলিস্‌।"

নিতাই একটু অপ্রস্তুত হইয়া কহিল,—"কি বলেছি আপনাকে বাবু, যে আপনি আমায় নেমকহারাম বলে গাল দিলেন ?"

হরলাল তেমনই ক্রুদ্ধ স্বরে কহিলেন,—"ঢের হয়েছে, আমি সোজা কথা বলে দিচ্ছি, কাজের হিসেব না করে এক পয়সাও দেব না।"

নিতাইও আর থাকিতে পারিল না, বলিয়া ফেলিল,—"এ দেখছি খাটিয়ে টাকা না দেবার মতলব বাবু!"

হরলাল গর্জ্জিয়া উঠিল,—"কি বল্‌লি!"

নিতাই উত্তেজিত হইয়া কহিল—"অন্যায় আর কি বলেছি বাবু, গরীব মানুষ, দুমুটো ভাতের জন্যে প্রাণপণ করে খাট্‌লাম, আর আপনি কিনা বল্‌চেন এখন টাকা দেব না, একি ভাল কথা বাবু!"

হরলাল—ক্রোধকম্পিতকণ্ঠে কহিল. "বের হ' আমার আপিস থেকে, তোর মত নেমকহারামকে একদণ্ড আপিসে জায়গা দেব না।"

নিতাইও বলিয়া উঠিল,—"এখন ত ওকথা বল্‌বেন বাবু! আমার পাওনা টাকা কটা ফেলে দিন. আমি এখনই বেরিয়ে যাচ্ছি।"

হরলাল হাঁকিল, "দরওয়ান! এখনই বের ক'রে দে আপিস থেকে। নেমকহারাম!"

দরওয়ান রামসিং নিতাইয়ের নিকট গিয়া কহিল,—"নিতাইবাবু, আজ বাবু রেগে রয়েছেন—আপনি বাড়ী যান, আজ আর কিছু বল্‌বেন না।"

অপমানিত ক্ষুব্ধ নিতাই বাহিরে চলিয়া গেল। নীচে গিয়া দরওয়ান তাহার হাতে দুইটী টাকা দিতেই তাহার দুই চোক দিয়া ঝর্‌ঝর্ করিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

দরওয়ান কহিল,—"বাবু আপনারা পুরোণ লোক, মনিবের কথায় রাগ কর্‌লেন ?"

• নিতাই চোখের জল মুছিয়া কহিল,—"না দরওয়ান রাগ কর্‌ব কেন? মনে সত্যি ভারি লেগেছে, আমাকে কিনা বাবু নেমকহারাম বল্লেন!"

সেখানে বৃদ্ধ জীবন চাটুয্যে দাঁড়াইয়াছিল; সে কহিল,—"দরওয়ানজি তোমরা ত নিতাইয়ের ঘরের খবর জান না—আজ না হয় ওর এই দুর্দ্দশা হয়েছে। কিন্তু ও ত বড় ঘরের ছেলে! ও যদি তখন একটু বুঝে চল্‌ত, তাহ'লে কি আর এই দশা হ'ত? বাবু ত জানেন, সেবার গ্রাহকের নাম কটা নেবার জন্যে—কাগজওয়ালা কত টাকা কব্‌লেছিল; বাবু তবু জেনে শুনে কিনা ওকে নেমকহারাম বল্লেন!"

খানিকপরে নিতাই আবার হরলালবাবুর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—"বাবু, আমায় মাপ করুন।"

হরলাল উচ্চ কণ্ঠে কহিলেন,—"ও সব মাপটাপের ধার আমি ধারিনে। তোমার মত নেমকহারামকে আমি কছুতেই জায়গা দেব না।"

নিতাই আর কিছু না বলিয়া ম্লানমুখে সে কক্ষ ত্যাগ করিয়া গেল।

(২)

প্রায় পনর দিন হাঁটাহাটি করিয়াও কোথাও কিছু সুবিধা করিতে না পারিয়া নিতাই বলরামবাবুর নিকট গিয়া উপস্থিত হইল।

বলরাম বাবু তাহাকে দেখিয়া গম্ভীরমুখে কহিলেন,—"এই যে নিতাই, খবর কি হে?"

নিতাই করযোড়ে কহিল,—"আজ্ঞে বড় কষ্টে পড়েছি।"

বলরাম বাবু কহিলেন,—"তোমার কাজ যাওয়ার কথা আমি সেইদিনই শুনেছি—সে ত প্রায় পনর দিন হ'ল—এখন আমার কাছে এসেছ কি মনে করে?"

নিতাই বিনীতকণ্ঠে কহিল,—"আজ্ঞে যদি দয়া ক'রে আপনার এখানে আমায় রাখেন।"

বলরাম বাবু আরও গম্ভীর হইয়া কি চিন্তা করিতে লাগিলেন।

নিতাই আবার কহিল,—"আপনি দয়া না কর্‌লে, ছেলেটা না খেতে পেয়ে মারা যাবে।"

বলরাম বাবু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া কহিলেন,—"অন্য সব জায়গা ঘুরে দেখলে যে কোথাও কিছু হ'ল না, তখন আমার কাছে এসেছ, কেমন?"

নিতাই সত্য কথা গোপন করিল না। এটা তাহার প্রকৃতির বাহিরে। সে সরল মনে কহিল,—"আজ্ঞে সে কথা সত্যি, আমি অনেক জায়গা ঘুরেছি, কোথাও কিছু করে উঠতে পারিনি। এখন আপনার আশ্রয়ে এসেছি।"

বলরাম বাবু গম্ভীরভাবে কহিলেন, "তা তোমাকে আমি রাখ্‌তে পারি, তবে একটা কথা আছে। হরলাল চাটুয্যে আবার ডাক্‌লেই যে তুমি কাজ ফেলে দু'দিন পরে চলে যাবে, তাহ'লে কিন্তু তোমায় আমি জায়গা দিতে পারব না।"

নিতাই সাগ্রহে কহিল,—"এ কথা আপনি একশ'বার বল্‌তে পারেন। হরলাল বাবু পুরাণ মনিব বটে, কিন্তু আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি তিনি ডাক্‌লেও আমি আপনার কাজ ছেড়ে যাব না। অসময়ে আপনি আমার উপকার করেছেন—সে কথা আমি কোন দিন ভুলব না।"

বলরামবাবু পাকা লোক। তিনি কহিলেন,—"দেখ, সুধু কথায় কোন কাজ হ'বে না—তোমাকে লেখাপড়া করে দিতে হ'বে পাঁচ বচ্ছরের মধ্যে তুমি অন্য কোথাও যেতে পাবে না। অবশ্য তোমায় আমি বছর বছর মাইনে বাড়িয়ে দেব।"

নিতাই কৃতজ্ঞতার সহিত কহিল,—"আজ্ঞে তা আমি জানি—বেশ, আমি লেখাপড়াই করে দেব।"

এই বলরামবাবু কয়েকমাস পূর্ব্বে নিতাইকে এক শত টাকা ঘুষ দিয়া হরলাল বাবুর কাগজের নামের তালিকাটি সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু নিতাইকে কিছুতেই সম্মত ক'তে পারেন নাই। তাহা ছাড়া মাস দুই পূর্ব্বে বলরামবাবুর লোকের অত্যন্ত অভাব হইয়া পড়িয়াছিল, এবং তিনি বেশী মাহিনা স্বীকার করিয়া হরলাল বাবুর প্রেস হইতে লোক ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কেবল নিতাইয়ের জন্য [illegible] কৃতকার্য্য হন নাই।

৩

এই ঘটনার পর প্রায় বৎসর দুই কাটিয়া গিয়াছে। নিতাইয়ের এখন আর সে হা-অন্ন যো-অন্ন অবস্থা নাই। বলরামবাবু [illegible] নিয়মিত বেতন দিয়া থাকেন। এমনই করিয়া আরও তিন মাস অতিবাহিত হইয়া গেল।

অনবরত সাত আট বৎসর সিসা ঘাঁটিয়া হঠাৎ একদিন কি করিয়া তাহার দেহে সিসার বিষ সঞ্চারিত হওয়ায় সে শয্যাশায়ী হইল। দুই মাস রোগে ভুগিবার পর সে কোন রকমে সে যাত্রা রক্ষা পাইল। এই দুই মাস বলরামবাবু তাহাকে পুরাবেতন দিয়া আসিয়াছেন. এবং মাঝে মাঝে আরও কিছু অতিরিক্ত দিয়াও সাহায্য করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও চিকিৎসার খরচ কুলায় নাই। এ দুই বৎসরের সামান্য যাহা-কিছু সঞ্চয়, তাহা সমস্তই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে।

নিতাই এখন সবে উঠিয়া হাঁটিয়া বেড়াইতে পারে। এমন সময় আর একটি বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই দুই মাস নিতাইকে লইয়া

তাহার পত্নীকে অহরহঃ যমের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছে, তাই পুত্রের প্রতি সে একেবারেই দৃষ্টি রাখিতে পারে নাই। কখন যে লিভার ধীরে ধীরে শিশুর উদরের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করিয়া শিশুকে দিন দিন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর করিয়া ফেলিতেছিল, তাহা তাহার চোকে পড়ে নাই। দিন দুই পূর্ব্বে যখন শিশু জ্বরের প্রকোপে শয্যাগ্রহণ করিল, তখন নিতাইয়ের পত্নীর দৃষ্টি আকর্ষিত হইল। কিন্তু তখন ব্যাধি এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া বলিয়া গেলেন,—"এযে সাংঘাতিক হ'য়ে দাঁড়িয়েছে—চিকিৎসার প্রায় বাইরে চলে গেছে - তবে যদি এখনই একে মধুপুর, সিমুলতলা কি ঝাঁঝাঁয় হাওয়া বদ্‌লে আন্‌তে পার, তা হ'লে হয় ত এ যাত্রা বাঁচ্‌লেও বাঁচ্‌তে পারে।"

নিতাই অকূল সাগরের মধ্যে গিয়া পড়িল। তাহার দেহের এই এই অবস্থা, এখনও সে রীতিমত বল পায় নাই। তাহার উপর যাহা কিছু ছিল, সমস্তই শেষ হইয়া গিয়াছে। এই রুগ্ন দুর্ব্বল দেহে কপর্দ্দকশূন্য অবস্থায় সে কি করিয়া কি করিবে! ডাক্তার বলিয়াছে হাওয়া বদ্‌লান ছাড়া তাহার পুত্রটিকে রক্ষা করিবার আর কোন উপায় নাই,——ঔষধে কোন ফল হইবে না। তাহার মত অবস্থার লোকের পক্ষে দূর পশ্চিমে হাওয়া বদ্‌লাইতে লইয়া যাওয়া এক প্রকার অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। সে যে শুধু টাকার খেলা! সে টাকা সে কোথায় পাইবে! তাহার এমন কেহ আত্মীয়বন্ধু নাই, এ সময় টাকা দিয়া সাহায্য করে—তাহার স্নেহের পুত্তলিটিকে মৃত্যুর গ্রাস হইতে রক্ষা করে! হায়, সে কি করিবে! এমনই করিয়া তাহার চোকের সম্মুখে তাহার কত আদরের—ঐ স্নেহের দুলালটি একটু একটু করিয়া শুকাইয়া মরিবে,—আর সে কোন উপায়ই করিতে পারিবে না! এমনই করিয়া ভাবিতে ভাবিতে দুই দিন কাটিয়া গেল, কোন কিনারা হইল না। সেদিন নিতাই

ছেলেটিকে বুকের সঙ্গে চাপিয়া ধরিয়া শয্যায় পড়িয়া চোকের জল ফেলিতেছিল, আর ভগবান্‌কে ডাকিতেছিল। এমন সময় বাহিরে বলরামবাবুর কণ্ঠস্বর শুনা গেল। "নিতাই, আমি" বলিয়া তিনি সেই কক্ষমধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। নিতাই তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিতে গেলে তিনি কহিলেন,—"না না উঠ না, দুর্ব্বল শরীর। হঁ্যা, শুন্‌লাম নাকি তোমার ছেলেটির খুব অসুখ করেছে ?"

নিতাই ব্যথিতস্বরে কহিল,—"আজ্ঞে হঁ্যা—ডাক্তারবাবু বল্‌ছিলেন চিকিৎসায় কিছু হবে না।"

বলরামবাবু কহিলেন,—"আমি ডাক্তারের মুখে সব শুনেছি। তার জন্যে আর ভাবনা কি! দুমাস ঘুরে এলেই তোমার ছেলে সেরে যাবে।" নিতাই কি বলিতে যাইতেছিল তিনি বাধা দিয়া আবার কহিলেন,—"টাকার কথা ত, আমি রয়েছি তার জন্যে ভাবনা কি!"

নিতাই অবাক্ হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

বলরামবাবু আবার কহিলেন,—"সিমুলতলায় আমার এক বন্ধুর বাড়ী আছে, আমি আজই তাঁকে টেলিগ্রাম করে দিচ্ছি, তুমি আপাততঃ পথ খরচ ও অন্যান্য খরচের জন্য এই পাঁচশ টাকা রাখ।" এই বলিয়া তিনি তাঁহার দরওয়ানকে ডাকিয়া বলিলেন,—"টাকার থলিটা দিয়ে যা।" তারপর টাকার থলিটা নিতাইয়ের সম্মুখে রাখিয়া কহিলেন,—"এর মধ্যে গিনি ও টাকায় পাঁচশ আছে।"

কিন্তু এ সমস্তই যেন নিতাইয়ের নিকট ভোজবাজী বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। সে স্পষ্ট দেখিতেছে, স্পষ্ট সব শুনিতেছে, কিন্তু কিছুই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেছে না।

বলরামবাবু ডাকিলেন,—"নিতাই ?"

নিতাই উত্তরে সুধু "আজ্ঞে" এই একটি মাত্র কথা উচ্চারণ করিল—

আর কিছু তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। এও কি সম্ভব হইতে পারে!

বলরামবাবু কহিলেন,—"তা হ'লে নিতাই আমি এখন উঠি, তুমি কালই বেরিয়ে পড়্‌বার জন্যে তৈরী হয়ে নাও—"

এতক্ষণ পরে নিতাই কথা কহিল,—সে কম্পিতকণ্ঠে বলিল,—"বাবু এ কি সব সত্যি?"

বলরামবাবু হাসিয়া বলিলেন,—"সত্যি না ত কি আর মিথ্যে!"

নিতাইয়ের হৃদয় গভীর কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। বলরামবাবু মানুষ নয় দেবতা! তাহা হইলে তাহার বাছা রক্ষা পাইবে!

নিতাই তাহার পত্নীকে ডাকিয়া কহিল,—"দেবতার পায়ের ধূলা নাও, আর কোন ভয় নেই—খোকা আমাদের সেরে উঠ্‌বে।"

বলরামবাবু বাড়ী ফিরিবার জন্য উদ্যত হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন,—"নিতাই, তুমি বোধ হয় শোননি, হরলালের কাগজ উঠে গেছে।"

নিতাইয়ের আপনাআপনি দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল। সে বলিয়া উঠিল, "আহা!"

বলরামবাবু আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন,—"তুমি তার জন্যে আবার আহা বল্‌ছ, কত গরীবের যে ও টাকা মেরে দিয়েছে তার কথা নেই—তোমারও ত একশ টাকার ওপর মেরে দিয়েছে, ও সব লোকের যদি শাস্তি না হয়, তা হ'লে ধর্ম্ম থাক্‌বে কেন—লোক ঈশ্বরকে মান্‌তে চাইবে কেন?"

নিতাই তবুও বলিল,—"হাজার হ'ক অনেকদিন তাঁর নুন খেয়েছি—তাই মনটা কেমন করে উঠ্‌ল।"

বলরামবাবু কহিলেন,—"তা সত্যি কথা! যাক্ দেখ, সেদিন হর-লালকে আমি লোক দিয়ে বলে পাঠালাম, তোমার কাগজ ত উঠে গেল,

এখন নামগুলো আমার দাও। অবশ্যি আমি সুধু চাইনি, তার জন্যে অনেক টাকা দিতে চেয়েছিলাম—তার উত্তরে আমাকে যা মুখে এল, তাই ব'লে গাল দিয়ে সে বল্লে—পুড়িয়ে ফেল্‌ব, তবু বলরাম বোসকে একটা নামও দেব না। দেখলে লোকটার তেজ! আমিও সহজে ছাড়্‌ছি না। হাতে পায়ে ধরে নাম আমার বাড়ী পৌছিয়ে দেবে, তবে ছাড়্‌ব। এখন কথা হ'চ্ছে তোমাকে আমার একটু সাহায্য করতে হবে।"

নিতাই ভয়ে ভয়ে কহিল,—"আজ্ঞে কি করতে হ'বে?"

বলরামবাবু হাসিয়া কহিলেন,—"না এমন কিছু না।" এই বলিয়া একখানি কাগজ পকেট হইতে টানিয়া বাহির করিয়া নিতাইয়ের সম্মুখে ধরিয়া আবার কহিলেন,—"এই কাগজে সাক্ষী বলে সুধু সই করতে হ'বে। তুমি ওর ওখানে গোড়া থেকে ছিলে, তোমার সাক্ষী জোর হ'বে।"

নিতাই মনে মনে অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া কহিল, "আজ্ঞে কিসের সাক্ষী হ'তে হ'বে?"

বলরামবাবু মৃদু হাসিয়া কহিলেন,—"এই ছ' বছর আগে তার কাছে আমি কতকগুলি গয়না জমা রেখেছিলাম, তারই তুমি সাক্ষী।"

নিতাই জড়সড় হইয়া কহিল,—"আজ্ঞে আমি ত তা দেখিনি।"

বলরামবাবু হোহো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, "সাক্ষী বুঝি সব সময় দেখে থাকে নাকি! আসল ব্যাপারটা কি বলি শোন, আমি কোন রকমে একখানি সাদা কাগজে তার সই করিয়ে নিয়েছি, সেই কাগজে লোক দিয়ে লিখিয়েছি যে, অমুক সালে হরলাল আমার এই এই গহনা গচ্ছিত রাখিয়াছে। এখন তা দিতে চাহিতেছে না। গয়না গচ্ছিত রাখার সাক্ষী তোমাকে দিতে হ'বে। এখন কাগজে সই করে দিলেই চল্‌বে, তার পর মকর্দ্দমার সময় ডাক পড়্‌বে। তুমি সুধু বল্‌বে, "ঐ সইটা হরলালের,—এই সইটা আমার।"

নিতাইয়ের বুক কাঁপিয়া উঠিল। বক্ষ স্পন্দন দ্রুত হইতে দ্রুততর হইতে লাগিল। তাহার সেই আনন্দোজ্জ্বল মুখখানি হঠাৎ বজ্রাহত বনস্পতির মত বিকৃত আকার ধারণ করিল। কি সর্ব্বনাশ! এই জাল-দলিলের সাক্ষী হইতে হইবে? তাহার অন্তরাত্মা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—"না, না, অত বড় অন্যায় আমি করিতে পারিব না!"

বলরামবাবু কাগজখানি পকেটে পুরিয়া কহিলেন,—"তার জন্যে আজ তোমার ব্যস্ত হতে হবে না। কাল যাওয়ার আগে এক সময় একটা সই করে দিয়ে গেলেই হ'বে, এ ত একটা বিশেষ কোন হাঙ্গামার কাজ নয়। টাকা রইল, ছেলেটাকে নিয়ে কালই বেরিয়ে পড়বার বন্দোবস্ত ক'রে ফেল।" এই বলিয়া তিনি কোন উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়া ধীরে ধীরে নিতাইয়ের গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

টাকার থলি সম্মুখে রাখিয়া নিতাই ভাবিতে লাগিল। এই টাকা-গুলার উপর তাহার একমাত্র সন্তানের জীবনমরণ নির্ভর করিতেছে। পরক্ষণেই তাহার মনে হইল, কত বড় অন্যায় করিয়া তাহার এই টাকা-গুলা ব্যয় করিবার অধিকার জন্মিবে! হায়, সে এখন কি করিবে! সেদিন সে কিছু খাইল না। পড়িয়া পড়িয়া কেবলই ভাবিতে লাগিল। তাহার অন্ত-রের মধ্যে যেন দুইটা প্রকাণ্ড মত্ত হস্তী তুমুল যুদ্ধ করিতেছিল, তাহাদে-রেই আস্ফালনে তার অন্তর ক্ষতবিক্ষত হইয়া যাইতেছিল! একটা সই করিলে এ টাকাগুলা সমস্তই তাহার হইবে, তাহার মরণাপন্ন পুত্রটিকে পশ্চিমে হাওয়া খাওয়াইয়া মরণের হাত হইতে ফিরাইয়া আনিতে পারিবে! সারারাত্রি তাহার বিনিদ্র অবস্থায় কাটিয়া গেল। ভোরের হাওয়ায় সে ঘুমা-ইয়া পড়িল।

* * * *

বলরামবাবু তখন বাহিরের ঘরে বসিয়া তিন জন বন্ধুর সহিত চা খাই-

তেছিলেন। এমন সময় নিতাই আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। বলরামবাবু চায়ের বাটিটি ফরাসের উপর রাখিয়া কহিলেন,—"এই যে নিতাই, এত সকালে যে? সব গোছান হয়ে গেছে ত?"

নিতাই তাহার এতগুলি প্রশ্নের কোন একটিরও উত্তর দিল না। সে গায়ের কাপড়ের ভিতর হইতে সেই টাকার থলিটি বাহির করিয়া ফরাসের উপর রাখিয়া দিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

বলরামবাবু আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কি হে?"

নিতাই আস্তে আস্তে কহিল,—"আজ্ঞে আপনার সেই টাকার থলে।"

বলরামবাবু কহিলেন,—"ও আমি কি করব। ও তোমাকে আমি দিয়েছি, ওতে আমার আর কোন অধিকার নেই।"

নিতাই পরিষ্কার কণ্ঠে কহিল,"আজ্ঞে ও টাকা আমি নিতে পারব না। আমরা গরীব মানুষ ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করি, ও আমাদের সহ্য হবে না।"

বলরামবাবু খানিকক্ষণ অবাক্ হইয়া নিতাইয়ের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া হাসিয়া বলিলেন,—"এই কথা, তার জন্যে ব্যস্ত কেন, একটু বস। এই বলিয়া বলরামবাবু টাকার থলিটি খুলিয়া ফেলিয়া গিনি ও টাকাগুলা ফরাসের উপর ঢালিয়া ফেলিলেন। তারপর আবার নিতাইকে কহিলেন, —"ডাক্তার বাবুর সঙ্গে কাল রাত্তিরে আবার দেখা হয়েছিল,তিনি বল্লেন আর দুদিন দেরী করে সিমুলতলা পাঠালে কোন ফল হবে না, ছেলেটা কিছুতেই বাঁচবে না।"

নিতাই সম্মুখের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিল। গিনিগুলা ঝক্‌মক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল প্রলোভন যেন শতবাহু মেলিয়া তাহাকে বন্দী করিবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছে! সে ভয়ে দুই পা পিছাইয়া দাঁড়াইল। তার পর করপুটসংলগ্নহস্তে বলরামবাবুকে প্রণাম করিয়া নীরবে সে কক্ষত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

নূতন গিন্নী

১

রায়পুরের চৌধুরীদের মেজকর্ত্তা দশ বৎসর কাশীবাস করিবার পর আবার যখন স্বগ্রামে ফিরিয়া আসিলেন, তখন অত বড় জমীদারীর সর্ব্বময় কর্ত্তা হরিচরণ চৌধুরী মহাশয় সহসা অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া উঠিলেন। মেজকর্ত্তাকে মহাসমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া মুখে কহিলেন বটে, "দাদা তুমি ফিরে এসে আমায় রক্ষা কল্লে, দুদণ্ড তবু হাপ ছেড়ে বাঁচতে পারব। জমীদারী সব বুঝে পড়ে নাও, আমায় অব্যাহতি দাও। বড়দাদা আমাদের ছেড়ে এজন্মের মত চলে গেলেন, ওদিকে তুমি আমার উপর সমস্ত ভার চাপিয়ে কাশীবাসী হলে। একা আমি এ সাম্‌লাতে পারি! আঃ এইবার বাঁচলাম!" কিন্তু মনে মনে তিনি ভারি অস্থির হইয়া উঠিলেন। এতদিন তিনি নিশ্চিন্তমনে নির্ব্বিবাদে সমস্ত সম্পত্তি ভোগ দখল করিতেছিলেন, একদিন স্বপ্নেও যে কথা ভাবিতে পারেন নাই, মেজকর্ত্তার আগমনে তাহাই ঘটিয়া বসিল। কেননা মেজকর্ত্তা একা ফেরেন নাই, সঙ্গে দ্বিতীয় পক্ষের পত্নী ও বৎসর পাঁচেকের একটি পুত্র সন্তান। প্রথমা পত্নীর বিয়োগের পর মেজকর্ত্তা সংসারত্যাগী হইয়া কাশীবাস করিয়াছিলেন, হরিচরণ

মাসে মাসে তাঁহাকে নিয়মিত খরচ পাঠাইতেন। এই সংসারত্যাগী মেজ-কর্ত্তা যে আবার একটি যুবতীর পাণিগ্রহণ করিয়া দেশে ফিরিবেন, এটা ছোট কর্ত্তা এত বড় জমিদারীর সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়াও একেবারে ভাবেন নাই, না হইলে হয়ত এতদিনে তিনি যাহা হ'ক ব্যবস্থা করিয়া ফেলিতেন। বড় জমিদারীর একমাত্র মালিক হইতে গেলে মাঝে মাঝে দুই একটা অসাধ্য-সাধনও করিয়া ফেলিতে হয়। মেজকর্ত্তাও একদিন এই জমীদারীতে একচ্ছত্র আধিপত্য করিয়া গিয়াছেন, কাজেই জ্যেষ্ঠ ভাই হরিচরণের বহিঃ-প্রকৃতি ভেদ করিয়া অন্তরে প্রবেশ লাভ করিতে, তাঁহার বিলম্ব ঘটিল না। তিনি উত্তরস্বরূপ মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "ভাই, আমার কি খাট্‌বার সামর্থ্য আছে, না বয়স আছে, যেমন কাশীতে খেতে দিতে, এখানেও তেমনই দুমুটো খেতে দিও—সেখানেও বিশ্বেশ্বরের নাম কর্ত্তাম, এখানে বসেও তাই করব।" হরিচরণ মনে মনে বলিলেন, "দাদা এটুকু বোঝবার বুদ্ধি আমার আছে। তোমার পথ তুমি দেখ, আমার পথ আমি দেখে নেব ; তোমাকে তার জন্যে আর মায়া দেখাতে হবে না।"

মাস ছয়েক পরে মেজকর্ত্তা একদিন নূতন গিন্নীকে বলিলেন, "নতুন বৌ, সব গুছিয়ে গাছিয়ে নাও, কালই কাশী রওনা হ'তে হ'বে।"

নূতন গিন্নী অবাক্ হইয়া বলিলেন, "তোমার সবই যেন কেমনধারা, বেশ ত বাড়ীতে এলে আবার হঠাৎ কাশী যাওয়ার খেয়াল চাপ্‌ল কেন? অত দূরে থাক্‌লে বিষয়-আশয় সমস্তই যে একেবারে বেহাত হ'য়ে যাবে। শেষে ছেলেটাকে পথে বসাবে?"

মেজকর্ত্তা তখন তামাক টানিতেছিলেন, টানিয়াই যাইতে লাগিলেন। তাঁহার মুখনিঃসৃত গাঢ় ধূম তাঁহার মাথা ছাড়াইয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া ক্রমে উপরে উঠিতে লাগিল। খানিক পরে তিনি নলটি একপাশে রাখিয়া

দিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "নূতন গিন্নি, অনেক ভেবে চিন্তে আবার কাশী ফিরে যাওয়াই স্থির করেছি, তুমি তা বুঝবে না।"

নূতন গিন্নী বিদ্রূপের স্বরে কহিল, "হ্যা গো হ্যাঁ, যত বোঝ তুমি, আমি গরীবের মেয়ে বিষয়-আশয়ের কি বুঝি, এই ত তোমার কথা।"

মেজকর্ত্তা তবুও হাসিতে লাগিলেন; এবং হাসিতে হাসিতেই বলিলেন, "যা বলেছ তা মিথ্যে নয়, জমিদারের মেয়ে হ'লে তবুও কতকটা বুঝতে, সত্যই তুমি এ সব বুঝবে না।"

নূতন গিন্নী মুখ ভার করিয়া রহিলেন। কোন উত্তর দিলেন না। তাঁহার স্বামী যে, কেন হঠাৎ একথা বলিলেন, তাহা তিনি একবার ভাবিয়া দেখিবারও চেষ্টা করিলেন না।

মেজকর্ত্তা তখন হাসি বন্ধ করিয়া বলিলেন, "নতুন গিন্নি, রাগ করলে বুঝি, আমার কথাটা বুঝলে না।"

নূতন গিন্নী ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "গরীবের মেয়ে আমার অত বোঝাসোঝার দরকার নেই।"

মেজকর্ত্তা উঠিয়া দাঁড়াইয়া পত্নীর নিকটে আসিয়া তাহার স্কন্ধদেশে হাত রাখিয়া কহিলেন, "নূতন গিন্নি তোমাদের জন্যেই আমাকে আবার কাশীবাসী হতে হ'চ্ছে।"

নূতন গিন্নী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "আমরা যদি তোমার এতই আপদ হয়ে থাকি, আমাদের বিদেয় করে দিলেই পার, আমাদের জন্যে তুমি কেন কাশীবাসী হ'তে যাবে।"

মেজকর্ত্তা কহিলেন, "তা হলে তোমায় স্পষ্ট করেই বলতে হ'ল। আমি বেশ বুঝতে পারছি, এখানে আর বেশী দিন থাকলে, খোকাকে বাঁচাতে পারব না।"

নূতন গিন্নী শিহরিয়া উঠিলেন। স্বামীর উপর তাঁহার যে ক্রোধের

উদয় হইয়াছিল, তাহা এক মুহূর্ত্তে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল। পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় তাঁহার বক্ষঃস্থল কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। কি সর্ব্বনাশ! তাঁহার জমীদারীতে কাজ নাই। তিনি বিষণ্নমুখে অপরাধীর মত স্বামীর মুখপানে চাহিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

মেজকর্ত্তা কহিলেন, "বুঝলে নূতন গিন্নি, জমিদারী করতে গেলে, এমন দুই একটা শিশু মাঝে মাঝে বলি দিতে হয় বৈ কি!"

নূতন গিন্নী ব্যগ্র হইয়া কহিলেন, "তা হলে আজই কাশী চল। ভগবান্ তোমাদের বাঁচিয়ে রাখুন, আমার বিষয়-আশয়ে কাজ নেই। আমি না বুঝে রাগ করেছি, আমায় মাপ কর।"

মেজকর্ত্তা সহজ শান্ত স্বরে কহিলেন, "তোমার কি দোষ নূতন গিন্নি, তুমি রাগ করতে পার বৈ কি। দেখ আমিও অনেক দিন জমিদারী করে গেছি। হরিচরণ কেন যতই পাকা হয়ে উঠুক না, আমার নজর এড়ান কিছু শক্ত। আমার কাণে এসে প্রায় সব কথাই পৌঁছায়। তা ব্যাপার যেরূপ দাঁড়িয়েছে, তাতে দুই একদিন দেরী করলে, কি হয় বলা যায় না।"

নূতন গিন্নী স্বামীর হাত চাপিয়া ধরিয়া কাতর স্বরে বলিলেন, "ওগো তোমার পায়ে পড়ি, কাল কেন, আজই চল আমরা কাশী রওনা হয়ে পড়ি।"

মেজকর্ত্তা একটু ভাবিয়া কহিলেন, "সে কথা মন্দ নয়। কিছু জানাজানি হ'বার আগেই আমরা বেরিয়ে পড়ি। জিনিষপত্তর পরে পাঠাবার ব্যবস্থা করে যাব'খন।"

এমন সময় খোকা ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া মাকে জড়াইয়া ধরিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, "মা, কাকাবাবু কাল সকালে আমাদের বোটে করে বেড়াতে নিয়ে যাবেন। বাবা, তুমি ত আমাদের সঙ্গে যাবে?"

নূতন গিন্নী খোকাকে কোলে তুলিয়া লইয়া বুকের সঙ্গে চাপিয়া ধরিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

মেজকর্ত্তা মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "নূতন গিন্নী শুন্‌লে ত? আমি ভেবেছিলাম, দু' একদিন দেরী হ'বে। তা ভাইয়ের আমার আর দেরী সইছে না। কোন রকমে রাত্তিরের গাড়ীতে রওনা হ'তে পার্‌লে হয়।"

নূতন গিন্নী সাহস দিয়া কহিলেন, "বাবা বিশ্বেশ্বর রক্ষে করবেন। চল সন্ধ্যের সময়ই আমরা বেরিয়ে পড়ি।"

২

বার বৎসর পরে নূতন গিন্নী তাঁহার পুত্রটির হাত ধরিয়া আবার বৃহৎ জমিদারভবনে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। মেজকর্ত্তার মৃত্যুর পর নিঃসহায় অবস্থায় একাকী কাশীতে বাস করিতে না পারিয়া বিধবা নূতন গিন্নীকে দেবরের শরণাপন্ন হইতে হইল। হরিচরণ চৌধুরী দুই ফোটা চোখের জল ফেলিয়া তাঁহাকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করিয়া কহিলেন, "বউ ঠাকরুণ, তোমাদেরই বাড়ীঘর, তোমাদেরই সব, এতটা কুণ্ঠিত হলে চল্‌বে না।" নূতন গিন্নী চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে আপনার নির্দ্দিষ্ট কক্ষে চলিয়া গেলেন।

এই দীর্ঘ বার বৎসর হরিচরণ চৌধুরীর প্রকৃতি অনেকটা শান্ত ভাব ধারণ করিয়াছিল সত্য, কিন্তু আর একজন আসিয়া যে তাঁহার এই বিপুল জমিদারীর অংশীদার হইবে, ইহা তিনি কিছুতেই সহ্য করিতে পারেন না। এবার নূতন গিন্নীর নিকট তাঁহার মনের এ ভাবটা কিন্তু অপ্রকাশ রহিল না।

প্রায় মাস খানেক পরে নূতন গিন্নী তাঁহার পুত্র গুণদাকে বলিলেন,

তুই যদি আমার কথা না শুনিস্, তা হ'লে তোকে এই ঘরে চাবি দিয়ে রাখ্‌ব, কোথাও বেরুতে দেব না। কোথায় ছিলি এতক্ষণ ?"

গুণদা মুখখানি এতটুকু করিয়া কহিল, "সারদার সঙ্গে বেড়াতে গেছলাম।"

নূতন গিন্নী ধমক দিয়া কহিলেন, "তোকে না সারদার সঙ্গে অত মেশামেশি করতে মানা করে দিয়েছি, তবু যে বড় তার সঙ্গে বেড়াতে গেছলি ?"

গুণদা মাথা হেঁট করিয়া মৌন হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

নূতন গিন্নী ক্রোধ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "না, কথায় তোর কিছু হবে না, তোকে সত্যি সত্যিই চাবী দিয়ে রাখতে হবে। চুপ করে এখানে বসে থাক।"

গুণদা নীরবে মাতার আদেশ পালন করিল। নূতন গিন্নী জানালার গরাদে ধরিয়া আকাশের পানে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন, তাঁহার দেবরের মত তাঁহার সন্তানও ত এই বিপুল ঐশ্বর্য্যের সমান অধিকারী, তবে কোন্ পাপে চোরের মতন তাহার নিজ গৃহে বাস করিতে সে বাধ্য হইতেছে! আহা, সে অবোধ শিশু, এই সংসারের কুটিলতার কোন খবরই সে রাখে না। বাড়ীর আর পাঁচজন ছেলের মতন তাহারও ত হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইবার ইচ্ছা হয়, কিন্তু তাহার সে ইচ্ছা পূর্ণ হইবার উপায় নাই। সে হয় ত মনে মনে তাহার জননীকে কত নিষ্ঠুরই না কল্পনা করে। অন্যের জননী তাহাদের পুত্রদের সাজাইয়া গুছাইয়া বেড়াইতে পাঠাইয়া দেয়। আর তাহার জননী পাষাণে বুক বাঁধিয়া এই কক্ষের মধ্যে তাহাকে রুদ্ধ করিয়া রাখে। হায়রে অদৃষ্ট! কিন্তু উপায় নাই। পুত্রকে সে কথা বুঝাইয়া বলিবার কোন পথ নাই। পুত্র মনে মনে যে অশান্তি ভোগ

করিতেছে, তাহা নিবারণের কোন উপায় নাই। এই কথা মনে হইবামাত্র নূতন গিন্নীর অন্তর অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া উঠিল। তাঁহার চোখ দিয়া তপ্ত অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তিনি তাড়াতাড়ি অঞ্চলপ্রান্তে চক্ষু মুছিয়া শুষ্কমুখে উপবিষ্ট পুত্রের পার্শ্বে গিয়া বসিয়া সস্নেহে তাহার মাথাটি বুকের উপর টানিয়া লইয়া কহিলেন, "গুণী, আমার কোলের উপর খানিকটা শুয়ে থাক!" গুণদা কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার নয়নের জলে জননীর বসন ভিজিয়া গেল। নূতন গিন্নী যে কত কষ্টে চোখের জল রোধ করিলেন, তাহা অন্তর্যামীই বলিতে পারেন। তিনি নীরবে কম্পিত হস্তখানি সন্তানের দেহে বুলাইতে লাগিলেন।

গুণদা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, তুমি আমায় আটকে রাখ বলে সবাই আমাকে কত ঠাট্টা করে। স্কুলে যেতে দাও না বলে সবাই কত কথা বলে।

নূতন গিন্নী পুত্রকে ভুলাইবার জন্য কহিলেন, "তোর লেখাপড়ার দরকার কি? তোর ত চাকরী করে খেতে হবে না যে, লেখাপড়া শিখবি। ওরা সব দুষ্ট ছেলে, তাই তোকে অমন কথা বলে। লক্ষ্মী বাবা আমার, আমি যা বলি তাই শুনিস্। আমার ঘরটি ছেড়ে কোথাও যাস্‌নি।"

ইহার দিন দুই পরে হরিচরণবাবু আসিয়া নূতন গিন্নীকে কহিলেন, "তোমার ব্যাপারখানা কি বল দিকি, ছেলেটাকে সব সময় আটকে রাখ।" নূতন গিন্নী মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, "তিনি বলে গেছেন সব সময় কাছে কাছে রাখতে।"

হরিচরণবাবু হাসিয়া বলিলেন, "মেজদাদা ত ঠিকই বলে গেছেন কিন্তু কাছে কাছে রাখার মানে কি চোরের মত কয়েদ করে রাখা। দুদিন পরে ওদেরই ত সমস্ত বিষয়-আশয় দেখতে হবে। লেখাপড়া না শিখে শুধু যদি ঘরের কোণে বসে থাকে, তা হলে বিষয়-আশয় রেখে কি খেতে পারবে? তবে তোমার ছেলে, তুমি যা ভাল

রোঝ করতে পার. কিন্তু লোকের কাছে যে আমায় কথা শুনতে হচ্ছে, তার ত একটা উপায় করতে হবে। তুমি ঘরের ভেতর থাক, কোন কথা ত তোমার কাণে পৌঁছায় না। এর মধ্যে দু'এক জনকে কাণা-ঘুঁষা করতে শুনেছি যে, আমিই নাকি ইচ্ছে করে তোমার ছেলেটিকে মূর্খ করে রাখছি। আজ যদি মেজদাদা থাকিতেন" শেষের দিকটা তাঁহার কণ্ঠস্বরটা যেন গাঢ় হইয়া আসিল। মনে হইল যেন বলিতে বলিতে তাঁহার স্বর রুদ্ধ হইয়া গেল, তিনি আর বেশী কিছু বলিতে পারিলেন না।

নূতন গিন্নী বড় বিব্রতা হইয়া পড়িলেন, কি উত্তর দিবেন। যদিও তিনি স্পষ্ট বুঝিতেছিলেন যে, তাঁহার দেবর দুরভিসন্ধিপ্রণোদিত হইয়া এই সব কথা বলিতেছেন, কিন্তু প্রকাশ্যে তাহার কোন প্রতিবাদ করা ত যাইতে পারে না। হা ভগবান! স্বামী আজ কি কঠোরকার্য্যে তাঁহাকে নিয়োগ করিয়া গিয়াছেন। তিনি ত নিশ্চিন্ত হইয়া হাসিতে হাসিতে স্বর্গে চলিয়া গেলেন, আর এই অভাগিনী সহায়হীনা নারী কি করিয়া তাঁহার সন্তানটিকে এই নিদারুণ বিপদ হইতে উদ্ধার করিবে। ওগো তুমি স্বর্গে থাকিয়া ত সব দেখিতেছ, তুমি একবার বলিয়া দাও, সে এখন কি করিবে। যে দেবরের হাত হইতে পুত্রটিকে রক্ষা করিবার জন্য তুমি কাশীবাসী হইয়াছিলে, সেই দেবরের নিকটে আসিয়াই সে আশ্রয় লইয়াছে। দেবরের সঙ্গে ত তাহার বিবাদ করা সাজে না। ওগো তুমি যে তাহাকে বার বার নিষেধ করিয়া গিয়াছ, তোমার ভ্রাতায় মুখের উপর কখন যেন কোন উত্তর সে না করে। কিন্তু এখন উপায়!

নূতন গিন্নীকে নিরুত্তর দেখিয়া হরিচরণবাবু বলিলেন, "তোমরা মেয়েমানুষ সংসারে কিসে ভাল হয়, কিসে মন্দ হয় তা বোঝবার ক্ষমতা তোমাদের নেই। মেজদাদার অবর্ত্তমানে আমিই এখন গুণদার অভিভাবক, তাহার ভাল

মন্দ সব আমারই উপর নির্ভর করছে। আমি কাল থেকে গুণদার স্কুলে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেব। আর এই যে আসা অবধি তুমি ওকে আলোচালের ভাত থাওয়াচ্ছ, এরই বা মানে কি। আমি সোজা বলে দিচ্ছি, এ সব চলবে না। বিধবার খোরাক যদি ওকে আর দুমাস খেতে হয়—তাহলে আর বাঁচতে হবে না। কাল থেকে ওবাড়ীর আর পাঁচজন ছেলের মত হয়ে থাকবে—এই ব্যবস্থা আমি করে গেলাম। এর ওপর তোমার আর কোন কথা চলবে না।"

এই বলিয়া হরিচরণ বাবু গম্ভীর পাদবিক্ষেপে সে স্থান ত্যাগ করিয়া গেলেন।

নূতন গিন্নী স্তব্ধ হইয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। অদূরে গুণদা নিরুদ্বেগে খাটের উপর শুইয়া নিদ্রা যাইতেছিল। তাহার দিকে চাহিয়া নূতন গিন্নীর অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। কত সতর্কতা অবলম্বন করিয়া তাঁহার সন্তানটিকে এত বড়টি করিয়া তুলিয়াছেন, এইবার বুঝি আর তাঁহার বাছাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি সামান্য নারী মাত্র, নারীর একমাত্র বল ভরসা স্বামী, তিনিও তাঁহাকে নিরাশ্রয় করিয়া এ জন্মের মত চলিয়া গিয়াছেন। হরিচরণ চৌধুরীর এ ত অনুরোধ নয়, আদেশ। এই দুর্দ্দান্ত প্রবল প্রতাপান্বিত জমীদারের আদেশ অমান্য করবার শক্তি তাঁহার কোথায়? আজ তাঁহার মনে হইল কাশী হইতে চলিয়া আসিয়া তিনি কি অন্যায়ই করিয়াছেন। কিন্তু উপায় যে ছিল না। তিনি ত সেইখানেই থাকিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু দুষ্টলোকের অত্যাচার ক্রমে এমনই ভীষণ হইয়া উঠিয়াছিল যে, সেখানে আর তিষ্ঠিতে না পারিয়া তিনি শত্রুর কবলে আসিয়া পড়িয়াছেন। হায়, এখন কি করিবেন। তাঁহার দুই চোখ দিয়া হু হু করিয়া তপ্ত অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তিনি কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন,—"ওগো তুমি যেখানেই থাক,

তুমি ছাড়া এ বিপদে আমার বাছাকে রক্ষা করিতে পারে, এমন আর কেহ নাই। ওগো তুমি তোমার সন্তানকে রক্ষা কর।” তিনি ধীরে ধীরে সন্তানের শিয়রের নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন। একদৃষ্টে সেই ঘুমন্ত সন্তানের মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। আহা, এমন সুন্দর ছেলে, সন্তানের পিতা হইয়া কোন্ প্রাণে ইহাকে বধ করিবে। কিন্তু হায়, অর্থের লোভে মানুষ না করিতে পারে—এমন কাজ নাই। অর্থের মমতা অন্য সমস্ত মমতাকে ছাপাইয়া যায়। দুরন্ত নির্ম্মল পদ্মার জল যে ভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়া একটা সমৃদ্ধ গ্রামকে গ্রাস করিতে একটু দ্বিধা একটু কুণ্ঠা বোধ করে না, তেমনই অর্থের প্রলোভন পৃথিবীর সমস্ত মায়ামমতা নির্ম্মমভাবে পেষণ করিয়া স্ফীত হইয়া যায়। নূতন গিন্নী আর ভাবিতে পারিতেছিলেন না, মাঝে মাঝে তাঁহার অন্তরের মধ্যে যেন খাঁ, খাঁ, করিয়া উঠিতেছিল। থাকিয়া থাকিয়া কেবল তাঁহার মনে পড়িতেছিল, যেন তাঁহার একমাত্র প্রিয়বস্তু হারাইতে বসিয়াছেন—প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও তাহা রক্ষা করিতে পারিতেছেন না। এইভাবে অনাহারে অনিদ্রায় তিনি সন্তানের শিয়রে বসিয়া সারারাত্রি কাটাইয়া দিলেন। ভোরের শীতল হাওয়া জানালা দিয়া প্রবেশ করিল, পাখীরা বাহিরে মহা কলরব জুড়িয়া দিল। গুণদা নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, জননী তাহার শিয়রে বসিয়া আছেন। গুণদা হাই তুলিয়া চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে ডাকিল,—“মা!” সে স্নেহের ডাকে, জননীর সারা অন্তর আলোড়িত হইয়া উঠিল। তিনি মনে মনে ভগবানের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া কহিলেন,—“হরিচরণ চৌধুরী যে, আমিও সেই, সে আদেশ দিবার কে? আমার সন্তানকে যে ভাবে ইচ্ছা সেইভাবে রাখিব, তাহার কথা শুনিব না। দেখি তাহার শক্তি।”

গুণদা কহিল,—“মা, তুমি অমন চুপ করে বসে কি ভাবচ?”

জননী তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন,—"না না, কিছু ভাবিনি বাবা, লক্ষ্মী বাবা আমার, তোকে একটা কথা বলি, তুই তোর কাকাবাবুর কোন কথা শুন্‌বি নি, তার ছেলের সঙ্গে মিশবি নি। এই ঘর ছেড়ে কোথাও যাবিনি!"

গুণদা কহিল,—"সে আমি পারব না, কাকাবাবুর কথা না শুন্‌লে কাকাবাবু বক্‌বে যে, তুমি বেশ ত মা; সবাই স্কুলে যায়, খেলা করে, আর আমি কি না চুপটি করে ঘরের কোণে বসে থাক্‌ব, সে কিছুতেই হ'বে না মা! তুমি আজ ভোরে উঠে বসে আছ, না হলে আমি কখন বেড়াতে বেরিয়ে যেতাম।"

জননী ব্যস্ত হইয়া কহিলেন,—"সে কি রে, তুই কি আমায় লুকিয়ে রোজ সকালে বেড়াতে যাস্ না কি?"

গুণদা কহিল,—"কি করি, তুমি কিছুতেই ছাড়বে না, কাজেই পালিয়ে যাই, সারদা দালানে দাঁড়িয়ে থাকে, আমরা দুজনে বেরিয়ে পড়ি। আবার তুমি ওঠবার আগে ফিরে আসি।"

কি সর্ব্বনাশ! নূতন গিন্নি ভয়ে স্তব্ধ হইয়া গেলেন। তাঁহার সমস্ত সতর্কতাকে ব্যর্থ করিয়া তাঁহার এমনই অবোধ সন্তান শত্রুর চক্রান্তে গিয়া পড়িয়াছে! আহা, তাহারই বা দোষ কি! সে সরল বালক, সে কি জানে তাহাকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র চলিতেছে। বাড়ীর অন্য সকলে কত আমোদ করিয়া বেড়ায়, সে বাড়ীর ছেলে হইয়া কি করিয়াই বা চোরের মত বন্ধ হইয়া থাকিবে। হায়! তাহার সম্মুখে যে কত বড় বিপদ আসন্ন হইয়া আছে, এ কথা যে তাহাকে বুঝাইবার উপায় নাই। একথা যে, সে কল্পনাও করিতে পারে না। এ যে সত্যই কল্পনার অতীত। নূতন গিন্নী মনে মনে স্থির করিলেন, এ কথা তাহাকে জানিতে দিবেন না। সন্তানের মঙ্গলের জন্য জননীকে কঠিন হইতে হয়, তিনি আরও কঠিন হইবেন,

তাহাকে কোন সময় চোখের আড়াল হইতে দিবেন না। আজ ত আর লুকোচুরি চলিবে না প্রকাশ্যভাবে তাঁহাকে দেবরের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইবে। তারপর যাহা অদৃষ্টে থাকে ঘটিবে।

নূতন গিন্নী ক্রোধ প্রকাশ করিয়া কহিলেন,—"তুই এমন দুষ্ট ছেলে, তাত জান্‌তাম না। তুই চোর হয়েছিস,—দেখি কি করে পালিয়ে যাস্, আজ থেকে তোকে চোরের মত কয়েদ করে রাখব। দেখি কি করে তুই ঘর থেকে বেরুস্।"

গুণদা ভয়ে কোন উত্তর করিল না।

সেদিন বেলা প্রায় নয়টার সময় হরিচরণ চৌধুরী তাঁহার পুত্রকে বলিলেন,—"গুণিকে যে ডেকে আন্‌তে বল্‌লাম।"

সারদা কহিল.—"ডাক্‌তে ত গেছলাম, সে আসতে চাইলে,—জ্যেঠাইমা তাকে কিছুতেই আসতে দিলে না। বল্লে, ওকে আমি কিছুতেই ঘর থেকে বেরুতে দেব না।" আমি তবু কত বল্‌লাম, শেষে জ্যেঠাইমা আমাকে ধমক দিয়ে বল্‌লে, তুই আমার ছেলেটার মাথা খাচ্ছিস, খবরদার তুই আমার ছেলেকে ডাকতে আসবি নি। আমি তাই চুপ করে চলে এলাম।"

হরিচরণ চৌধুরী আর কোন কথা বলিলেন না। গম্ভীর হইয়া সংবাদ পত্রে মনোনিবেশ করিলেন।

সেইদিন হইতে জমিদার গৃহের সকলেই নূতন গিন্নীর সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিল। নূতন গিন্নী যাহার সম্মুখ দিয়া যাইত, সেই তখন মুখ ফিরাইয়া লইত। এত বড় জমিদার গৃহে, তাঁহার এই শয়নকক্ষ ছাড়া আর কোথাও তাঁহার দাঁড়াইবার বা বসিবার স্থান রহিল না। কিন্তু হরিচরণ চৌধুরীর এই ব্যবস্থা নূতন গিন্নীর শাপে বর হইল। তিনি মনে মনে হাসিয়া পুত্রটিকে লইয়া সেই কক্ষমধ্যে স্বইচ্ছায় নির্জ্জন-কারাবাস-দণ্ড

ভোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু গুণদার :নিকট ইহা অত্যন্তই কারা-দণ্ডের মত অসহ্য বোধ হইল। তাহার জননীই যে এই শাস্তিভোগের হেতু, তাহা মনে করিয়া গুণদা জননীর উপর অত্যন্ত অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। কিন্তু জননীকে সে অত্যন্ত ভয় করিত বলিয়া, সে তাঁহার মতের উপর কিছু করিতে পারিত না। এমনই করিয়া দেখিতে দেখিতে প্রায় এক পক্ষ অতিবাহিত হইয়া গেল এবং জননীর বজ্র আঁটুনি ক্রমেই ফস্কা গেরোয় পরিণত হইল। গুণদা একটু ফাঁক পাইলেই বাহির হইয়া পড়িতে লাগিল। প্রথম প্রথম নূতন গিন্নী কিছুই জানিতে পারিতেন না। এমনই একদিন সন্ধ্যার সময় পুষ্করিণীর ঘাট হইতে কাপড় কাচিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, কক্ষ শূন্য, গুণদা নাই। তিনি কক্ষমধ্যে চারিদিক অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন, কোথাও গুণদা নাই। তিনি দুই একবার 'গুণি গুণি' করিয়া ডাকিলেন, কিন্তু কেহ সাড়া দিল না, কেবল প্রতিধ্বনি তাঁহাকে ভেঙ্‌চাইয়া চলিয়া গেল। তিনি সেইখানে দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিলেন। তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিল, নিশ্চয়ই তাঁহার সন্তানকে হরিচরণ চৌধুরী ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছেন,আর বাছাকে ফিরাইয়া দিবেন না। এই কথা মনে হইবামাত্র তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। এত চেষ্টা করিয়াও, এত অপমান সহ্য করিয়াও এ নির্জ্জন-কারাবাস-দণ্ড ভোগ করিয়াও তিনি তাঁহার বাছাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। এতক্ষণ হয়ত তাঁহার বাছাকে কি খাওয়াইয়া দিয়াছে। বিষের যন্ত্রণায় বাছা হয় ত কোন এক নির্জ্জন কক্ষে পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছে। নূতন গিন্নী দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া অসহ্য যাতনায় 'উঃ' করিয়া উঠিলেন। এ বাড়ীর কেহই তাঁহার সহিত কথা বলেন না, তিনি যে কাহারও নিকট পুত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিবেন, সে উপায়ও তাঁহার নাই। সমস্ত যন্ত্রণা মুখ বুজিয়াই সহ্য করিতে হইবে। এইভাবে প্রায় একঘণ্টা অতি-

বাহিত হইয়া গেল, তবুও গুণদা ফিরিল না। নূতন গিন্নী আর কক্ষের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারিলেন না। প্রথমেই বাটীর এক দাসীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "হা রে গুণদাকে দেখেছিস্", দাসী নাক সিটকাইয়া মুখ ঘুরাইয়া চলিয়া গেল। তিনি যত জনকে পুত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, কেহই তাঁহার কথার উত্তর করিল না, তাঁহার সম্মুখ হইতে প্রত্যেকেই সরিয়া গেল, প্রায় মিনিট পনর পরে তিনি আবার নিজের কক্ষে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার বড় আশা হইয়াছিল, ফিরিয়া গিয়া তাঁহার বাছাকে দেখিতে পাইবেন, কিন্তু শূন্য গৃহ দেখিয়া তিনি মেজের উপর আছ্ড়াইয়া পড়িলেন। খানিকক্ষণ এই ভাবে পড়িয়া থাকিবার পর কাণের নিকট পদশব্দে তিনি চমকিয়া উঠিয়া বসিতেই দেখিলেন, গুণদা চোরের মত অতি সন্তর্পণে ধীর পদবিক্ষেপে কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। নূতন গিন্নী পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন। গুণদাও কোন কথা না বলিয়া শয্যার উপর মুখ ঢাকিয়া শুইয়া পড়িল। তাহার জননী খানিকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে পুত্রের পাশে গিয়া উপবেশন করিয়া কোমল স্বরে কহিলেন, "কি হয়েছে রে গুণি, অমন করে শুয়ে পড়লি যে?" গুণদা কোন উত্তর করিল না। তেমনই মুখ বুজিয়া শুইয়া রহিল। মাতা তাহার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "হারে কোথায়, কিছু খাসনি ত! কেউ কিছু খাইয়ে দেয় নি ত?"

গুণদা মুখ তুলিয়াই ভয়ে ভয়ে উত্তর করিল, "না মা।"

জননী অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া আবার কহিলেন, "কেন আমায় না বলে পালিয়ে যাস বাবা, আর কখনও যাসনি। লক্ষ্মী বাবা আমার।" গুণদা কোন উত্তর করিল না। তখন গভীর রাত্রি। কোথাও কোন সাড়া শব্দ নাই। মাঝে মাঝে পেচকের কর্কশ স্বর সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ

করিতেছিল। অদূরে গৃহস্থ বাড়ীর সজাগ সারমেয়গণ মাঝে মাঝে গৃহস্থকে সতর্ক করিয়া দিতেছিল। নূতন গিন্নী গুণদার জামাটি শয্যার উপর হইতে তুলিয়া আল্‌নায় রাখিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় জামার পকেট হইতে একখানি কাগজের টুক্‌রা মেজের উপর পড়িল। তিনি অন্যমনস্ক ভাবে কাগজখানি কুড়াইয়া লইয়া আলোর সম্মুখে ধরিতেই আড়ষ্ট স্তব্ধ হইয়া গেলেন! একি! এই অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার পুত্র এতদূর অধঃপাতে গিয়াছে। তাঁহার এত সতর্কতা অবলম্বনের এই ফল! তিনি আর ভাবিতে পারিলেন না। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, হরিচরণ চৌধুরী এই কৌশলজাল বিস্তার করিয়া তাঁহার পুত্রের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে উদ্যত হইয়াছেন। পত্রখানি তখনও শেষ অবধি পড়া হয় নাই। তিনি পত্রখানি পড়িতে আরম্ভ করিলেন। শেষ অবধি পড়িয়া কম্পিত-পদে খানিকদূর গিয়া হাতবাক্স খুলিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন, তাঁহার স্বামী যে বালা জোড়াটি তাঁহাকে বিবহের সময় স্বহস্তে পরাইয়া দিয়াছিলেন, সে বালা জোড়াটি বাক্সে নাই। তিনি তন্ন তন্ন করিয়া সেই বাক্স ও অন্যান্য বাক্সগুলি অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন,কিন্তু কোথাও বালার সন্ধান মিলিল না। কি এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইতে-ছিল। তাঁহার চোখের জল একেবারে শুকাইয়া গিয়াছিল। তিনি কেবলই ভগবান্‌কে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন, "হা ভগবান্! কোন্ অপরাধে আমার এই সর্ব্বনাশ সাধন করিলে।" এমনই করিয়া কখন যে তাঁহার চোখের উপর রাত্রি পোহাইয়া গেল, তাহা তিনি বুঝিতে পারি-লেন না। জমিদারগৃহের দাসদাসীর কলকল রবে তিনি চকিত দৃষ্টিপাতে দেখিলেন, প্রভাতরবি পূর্ব্ব গগনে উদিত হইয়াছে। তিনি মনে মনে দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন, আরও কঠিন হইয়া পুত্রকে এ পাপপথ হইতে ফিরাইতে হইবে। হরিচরণ চৌধুরীর সমস্ত চক্রান্তের জাল ছিন্ন করিতে হইবে।

এতদিন তিনি দ্বার উন্মুক্ত রাখিয়াই কক্ষের বাহিরে যাইতেন। সেইদিন হইতে তিনি দ্বারে তালা লাগাইয়া বাহির হইতেন। গুণদা পিঞ্জরবদ্ধ পক্ষীর মত অনন্যোপায় হইয়া সেই কক্ষের মধ্যে ছট্‌ফট্‌ করিয়া বেড়াইত। নূতন গিন্নী যখন কক্ষে থাকিতেন, তখনও ভিতর হইতে তালাবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। এমনই ভাবে দিন চারেক কাটিয়া গেল।

দেখিতে দেখিতে পূজা আসিয়া উপস্থিত হইল। গুণদা প্রথমে জননীকে অনুরোধ উপরোধ করিল, তারপর এমনই কান্নাকাটি আরম্ভ করিল যে, এ পূজার দিন তাহাকে আর চোরের মত কারারুদ্ধ করিয়া রাখা জননীর অসম্ভব হইয়া উঠিল। তিনি অবশেষে পুত্রকে বলিলেন, "দেখ, তোকে ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু পূজার দালানের বাইরে যাবিনি বা কোথাও কিছু খাবিনি, যদি শুনি তুই পূজোর দালান ছেড়ে কোথায় গেছিস, তা হ'লে তোকে এমনি করে ফের আটকে রাখব।" গুণদা যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

সে দিন সপ্তমীর প্রভাত, বাহিরে ঝুপ ঝুপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল। কিন্তু আজ তাহাতে কাহারও ভ্রূক্ষেপ নাই। জমিদার-গৃহের সকলেই আনন্দোৎসবে মগ্ন। কেবল নূতন গিন্নী তাঁহার কক্ষে জানালার গরাদে ধরিয়া পাষাণমূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহার সেই স্বভাবসুন্দর আনন গভীর কালো মেঘে ছাইয়া গিয়াছে। তাঁহার মুখ একেবারে বিকৃত ভাব ধারণ করিয়াছে। তাঁহার অন্তরের সুতীব্র যন্ত্রণা মুখের উপর প্রতিফলিত হইয়া উঠিয়াছে। এমন সময় হঠাৎ শঙ্করী ঠাক্‌রুণ তাঁহার পায়ের উপর আসিয়া আছড়াইয়া পড়িলেন। নূতন গিন্নী চমকিয়া উঠিয়া পা সরাইয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে ঠাকুর ঝি ?"

শঙ্করী অনাথা দরিদ্র বিধবা। তিনি অতি দূর সম্পর্কে হরিচরণ চৌধুরীর ভগিনী, আজ দুই বৎসর হইল বিধবা হইয়া তিনি তাঁহার ত্রয়োদশ

বৎসরের পুত্রটিকে লইয়া জমিদারগৃহে আশ্রয় লইয়াছেন। পুত্র হরনাথকে লেখাপড়া শিখাইয়া কোন রকমে মানুষ করিয়া লইবার জন্য তিনি দাসীর মত এই বাড়ীর সমস্ত কাজ করিতেন। জমিদার-পত্নীর অন্যায় তীব্র ভর্ৎসনা, জমিদারগৃহের দাসদাসীর বিদ্রূপ, টিট্‌কারী ও অপমান মুখ বুজিয়া নীরবে সহ্য করিয়া যাইতেন। কিন্তু আজ তাহার সর্ব্বনাশ উপস্থিত! তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে নূতন গিন্নীকে বলিলেন "মেজবউ, তুমি ত আমার হরনাথকে জান, সে কখনও চুরি করে নি, তুমি তাকে বাঁচাও।"

নূতন গিন্নী কহিলেন, "কি হয়েছে ঠাকুরঝি, আমি ত কিছু জানিনি।"

শঙ্করী কহিলেন, "ছোটদার (অর্থাৎ হরিচরণ চৌধুরীর) ঘর থেকে আজ সকালে একছড়া হার নাকি চুরি গিয়াছে। ছোটদা হরনাথকে চোর বলিয়া ধরিয়াছেন, তিনি হরনাথকে কি একখানা কাগজ আনবার জন্যে সে ঘরে পাঠিয়েছিলেন, তারই প্রায় আধ ঘণ্টা পর ফিরে গিয়ে দেখেন তার বাক্স খোলা পড়ে রয়েছে হার নেই। আমি তোমার পা ছুঁয়ে বলছি, মেজবউ! হরনাথ কখ্‌খনও চুরি করে নি। সে দুঃখীর ছেলে, বড় গরীব, কিন্তু চোর নয়, তুমি তাকে বাঁচাও। বাছাকে হাত বেঁধে বৈঠকখানা ঘরে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। ছোটদা নায়েবমশায়কে হুকুম দিয়েছে যতক্ষণ না স্বীকার করে, ততক্ষণ বেত মার। ও মেজবউ, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আমার বাছাকে রক্ষে কর সে বেত খেলে মরে যাবে। সে যে কখনও কারু কাছে একটা চড় অবধি খায়নি।"

নূতন গিন্নী স্তব্ধ হইয়া সমস্ত কথা শুনিলেন। কোন উত্তর করিলেন না। সমস্ত বুকের মধ্যে তাঁহার তোলপাড় করিয়া উঠিল।

শঙ্করী হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। "মেজ-বউ, মেজ-বউ, ওই শোন আমার বাছাকে মারছে, ওই শোন বেতের শব্দ।"

. নূতন গিন্নী কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

শঙ্করী তেমনই কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "অ মেজ-বউ, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আমার বাছাকে বাঁচাও, ওই শোন আমার বাছা কাতরাচ্চে।"

তবুও নূতন গিন্নী কোন কথা কহিলেন না। যুক্ত করে উৰ্দ্ধনেত্রা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

শঙ্করী গভীর আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, "অ মেজ-বউ, বেতের শব্দ হচ্চে, বাছা ত আমার আর কাঁদ্‌বে না, অ্যা অ্যা বাছা তুমি আমার অজ্ঞান হয়ে পড়েছ, যাই যাই মুখে একটু জল দিইগে।"

এক ঘা বেতের শব্দ ও হরনাথের কাতর ক্রন্দন নূতন গিন্নীর অন্তরের মধ্যে তীব্র শলাকার মত গিয়া বিঁধিতে লাগিল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি যুক্ত করে স্বামী দেবতাকে প্রণাম করিয়া উন্মত্ত-প্রায় শঙ্করীর হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, "চল ঠাকুরঝি, আমি জানি তোমার ছেলে চুরি করেনি, এখনই আমি ছাড়িয়ে দেব।"

. নূতন গিন্নী শঙ্করীর হাত ধরিয়া বৈঠকখানা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। অন্দর ও বাহিরের মধ্য পথে দাঁড়াইয়া, তিনি হরিচরণ চৌধুরীকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। জমিদারবাবু কিছু আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। কিন্তু কোন কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে নূতন গিন্নীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "মেজ-বউ।"

নূতন গিন্নী গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "হরনাথকে কেন মিছিমিছি মার ধর করছ, ও চুরি করে নি, ওকে এখনই ছেড়ে দাও।"

হরিচরণ চৌধুরী মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "এই জন্যে ডেকেছ, আমি জমিদারী করে বুড়ো হলাম, এখন তোমার পরামর্শ মত কাজ করতে হবে নাকি।"

নূতন গিন্নী কহিলেন, "আমি বল্‌ছি তুমি এখনই ওকে ছেড়ে দাও, ও চুরি করে নি।"

হরিচরণ চৌধুরী হাসিয়া উঠিয়া কহিলেন, "সে আমি বুঝব'খন।"

আবার বাহিরে বেত্রাঘাতের শব্দ হইল। আবার হরনাথ কাতরে ক্রন্দন করিয়া উঠিল। শঙ্করী মেঝের উপর আছড়াইয়া পড়িয়া হরিচরণ চৌধুরীর পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন, "ও ছোটদা তোমার পায়ে পড়ি, ওকে ছেড়ে দাও, ও চুরি করে নি।"

হরিচরণ চৌধুরী পা সরাইয়া লইয়া কহিলেন, "ও চুরি করবে কেন, বাইরের লোক এসে ঘর থেকে হার চুরি করেছে!"

বাহিরে হরনাথ আর্ত্তস্বরে কাঁদিয়া উঠিল, "অ মাগো।"

নূতন গিন্নী মনে মনে স্বামী দেবতাকে প্রণাম করিয়া অন্তরের সমস্ত ব্যথা চাপিয়া দৃঢ়কণ্ঠে কহিলেন, "ঠাকুরপো, বাইরের লোক তোমার হার চুরি করে নি, ঘরের লোকই চুরি করেছে।" হঠাৎ তাঁহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল। তিনি নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া কহিলেন, "চুরি করেছে আমার গুণী, আমি নিজের চোখে দেখেছি, সে হার নিয়ে তোমার ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে।"

ব্রাহ্মণী

১

হোসেন যখন শঙ্করকে ধরিয়া বসিল, "ভাই আমি তোর মাকে গিয়া প্রণাম করিয়া আসিব," তখন শঙ্কর সত্যই অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িল। সে খানিকক্ষণ কোন উত্তর করিতে পারিল না। স্তব্ধ হইয়া হোসেনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। হোসেন কাতরকণ্ঠে কহিল, "তুই ভাই কিছু বল্‌ছিস্ না যে, তোর মা কি আমারও মা নয়। আমার যে বাপ মা কেহই নাই, তোর মা'ই ত এখন আমার মা। আজ আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে হইবে।" শঙ্কর তবুও নিঃশব্দে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। হোসেন একটু থামিয়া আবার কহিল, "ও বুঝেছি, আমি মুসলমান বলিয়াই বুঝি তোর ভয় হইয়াছে, তাই চুপ করিয়া আছিস। হ্যাঁ ভাই, মুসলমান বলিয়া কি আমি মাকেও গিয়া প্রণাম অবধি করিতে পারিব না। আমি না হয় দূর থেকে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আসিব।"

শঙ্কর এই যে হোসেনের বাড়ী যাতায়াত করে, তাহা অত্যন্ত গোপনে। কেন না তাহাদের গ্রামে দলাদলি ব্যাপারটা কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় ঘটিয়া

থাকে। এমন সমস্ত অকর্ম্মণ্য জীব আছে, তাহারা কেবল পরের ছিদ্র অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়, তাহারা এতটুকু খুঁৎ পাইলে, তিলকে তাল করিয়া তোলে। তাই জননীর মুখ চাহিয়া শঙ্কর এই শ্রেণীর লোকের ভয়ে হোসেনের সহিত খোলাখুলি রকমে মিশিতে পারিত না। কিন্তু তাহাদের পরস্পরের অন্তরের সহিত এমন একটা যোগাযোগ ঘটিয়াছিল যে, সমস্ত বাধা তুচ্ছ করিয়া দুই বন্ধু ব্রাহ্মণ মুসলমানের জাতিগত পার্থক্য ভুলিয়া একজন আর একজনকে প্রাণ খুলিয়া ভালবাসিত। এই গোপন মেলা-মেশার জন্য শঙ্করকে মাঝে মাঝে অনেক কথা শুনিতে হইত। সে সমস্তই মুখ বুঝিয়া সহ্য করিত। তাহার বাড়ীতে জননী ব্যতীত এক বিধবা পিসি থাকিতেন। তিনি ত তাহাকে দেখিলেই বলিতেন, "আজ গিয়েছিলি ত তুই, সেই ম্লেচ্ছর বাড়ী, না তোর জন্যে দেখছি জাতধর্ম্ম কিছুই থাকবে না, দেখ বউ, তুমি যে ছেলেকে মোছলমানের বাড়ী যাইতে দিতেছ, শেষকালে কিন্তু ইহার ফলভোগ করিতে হইবে। শঙ্কর কিছু কাণ্ড না বাধাইয়া ছাড়িবে না।" শঙ্করের জননী শুধু স্নেহার্দ্র কণ্ঠে কহিতেন, "বাবা শঙ্কর! লক্ষ্মী বাবা আমার, কাপড়টা কাচিয়া ঘরে ঢুকিস্।" শঙ্কর নীরবে হাসিমুখে জননীর আদেশ প্রতিপালন করিত। প্রচণ্ড শীতের রাত্রে কাঁপিতে কাঁপিতে সে পুকুরে গিয়া কাপড় কাচিয়া আসিত। এ কষ্টটুকু সে হোসেনের জন্য অনায়াসেই সহ্য করিয়া থাকে। কিন্তু হোসেনকে সে এ কথা জানিতে দেয় নাই, পাছে হোসেন ব্যথা পায় এই তাহার আশঙ্কা। তবে সে গোপনে হোসেনের বাড়ী গমন করিলেও, হোসেনকে তাহার বাড়ী আনিতে সাহস করে নাই। হোসেন প্রায় তাহার বাড়ীর নিকট অবধি আসিত, কিন্তু কোন দিনও তাহাদের বাড়ী আসে নাই। জননীর জন্য হোসেনের মনটা আজ অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, তাই সে শঙ্করের মাকে মা বলিয়া ডাকিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ব্যথিত অন্তরকে

শীতল করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছিল। শঙ্কর যে তাহা না বুঝিয়াছিল তাহা নহে, কিন্তু পাছে হোসেনকে ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিতে হয়, সেই ভয়ে শঙ্কর কোন উত্তর দিতে পারে নাই। হোসেনের কাতর কণ্ঠস্বরে সে আর স্থির থাকিতে পারিল না, কহিল, "ভাই, তোর মা বাঁচিয়া থাকিলে, আমিও যে তাঁর কাছে মা বলিয়া ছুটিয়া যাইতাম। কিন্তু আমাদের গ্রামের লোকগুলো যে বড় খারাপ, তারা যে—"

হোসেন বাধা দিয়া কহিল, "লোকের যাহা ইচ্ছা হয় করিতে পারে, কিন্তু মা কি ছেলের ভক্তিশ্রদ্ধা গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারিবেন। তুই কিছু ভাবিস্ না শঙ্কর, আমি বলিতেছি তোরই ত মা তিনি, আমি মুসলমান হইলেও তিনি আমায় কখনও তাড়াইতে পারিবেন না।" তাহার জননীর প্রতি হোসেনের এই অগাধ বিশ্বাস, এই আন্তরিক ভক্তিশ্রদ্ধার পরিচয়ে শঙ্করের অন্তর গভীর আনন্দে পরিপ্লুত হইয়া উঠিল। তাহার অন্তরের আশঙ্কা ও সংশয় সেই উচ্ছ্বসিত আনন্দের বেগে কোথায় ভাসিয়া গেল।

শঙ্কর হোসেনের হাত ধরিয়া একেবারে গৃহাভ্যন্তরে গিয়া প্রবেশ করিল। তাহার জননী তারাদেবী তখন গঙ্গাজলের পাত্রহস্তে কক্ষান্তরে যাইতেছিলেন, তাহাদের দেখিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

শঙ্কর হাসিমুখে কহিল, "মা, হোসেন এসেছে।"

হোসেন সেই সঙ্গে সঙ্গে কহিল, "মা আমি তোমায় প্রণাম করিতে আসিয়াছি।" এই বলিয়া হোসেন দ্বিধাশূন্য অন্তরে তারাদেবীর সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিয়া ভূমিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল, তারপর তাঁহার পদধূলি লইবার জন্য হাত বাড়াইল।

শঙ্কর ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "হোসেন।"

কিন্তু হোসেন তাহার কথায় কান দিল না। সে তারাদেবীর পদধূলি

গ্রহণ করিয়া ভক্তিভরে মাথায় দিল। তারাদেবী এতটুকু বিচলিত হইলেন না, করুণায় তাঁহার মাতৃহৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

হোসেন উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "মা জননী, আমার মা নাই, তুমিই যে আমার মা।"

তারাদেবীর দুই চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। তিনি ধীরে ধীরে গঙ্গাজলের পাত্রটি মাটিতে নামাইয়া রাখিয়া হোসেনের মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, কহিলেন, "বাবা হোসেন, আমিই তোমার মা।" এমন সময় শঙ্করের পিসিঠাকুরুণ কোথা হইতে ঝড়ের মত ছুটিয়া আসিয়া কহিলেন,—"হ্যাঁ বউ, এ তোমার কি রকম আক্কেল বল ত, কাচা কাপড় পরিয়া গঙ্গাজল লইয়া পূজা করিতে যাইতেছ, আর ঐ কে একজন তোমায় ছুঁইয়া প্রণাম করিল, আর তুমি মুখ বুজিয়া রহিলে। বারণ অবধি করিলে না। হারে শঙ্কর, তুই বা কেমন ধারা ছেলে, দাঁড়িয়ে দেখছিস্ তবু মানা কর্‌তে পারিস না। রাস্তার কাপড় না ছাড়িয়া অমনই যাকে তাকে ছুঁইয়া ফেল, তুমি কাদের ছেলে গা।"

হোসেন কোনরূপ অপ্রতিভ না হইয়া কহিল, "আজ্ঞে আমি হোসেন, পিসিমা।"

পিসিমা দুই চোখ কপালে তুলিয়া বলিয়া উঠিলেন, "হোসেন, মোছলমান। ওরে শঙ্করা এমনই করে আমাদের জাতধর্ম্ম সব মজালি! একটা মোছলমানের ছেলে এসে বউয়ের পায়ে হাত দেয়। অ্যাঁ মোছলমানের এত সাহস। ওরে আমার যে খুন হইতে ইচ্ছা যাইতেছে। হ্যাঁ বউ, কি সর্ব্বনাশ করিলে বল ত। আমি যে এর কুল কিনারা কিছুই দেখিতে পাইতেছি না।"

হোসেনের মুখখানি একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল। জননীকে প্রণাম করিলে এমনধারা একটা কাণ্ড যে ঘটিতে পারে, ইহা সে কল্পনাও করিতে

পারে নাই। বহুদিন সে মাতৃস্নেহ হইতে বঞ্চিত, আজ যে সে সেই হারাণ মাতৃস্নেহের যতটুকু পারে আদায় করিতে আসিয়াছিল। হায়! এমনই অভাগা সে।

শঙ্কর অত্যন্ত ভয় পাইয়া ছলছল নেত্রে জননীর মুখপানে চাহিয়া দেখিল, তাহার জননীর মুখের উপর প্রশান্ত স্নিগ্ধজ্যোতিঃ বিরাজ করিতেছে, মুখের উপর এতটুকু চাঞ্চল্যভাব নাই।

তারাদেবী সহাস্যমুখে কহিলেন, "ঠাকুরঝি, ও ছেলেমানুষ, ও কি অতশত বোঝে, ও জানে মাকে দেখিলেই প্রণাম করিতে হয়, তাই ও প্রণাম করিয়া ফেলিয়াছে। হ্যাঁ বাবা হোসেন, তোমার পিসিমাকে প্রণাম করিলে না?"

হোসেনের অন্তরের উচ্ছ্বসিত আনন্দ যেন গলিয়া চোখের মধ্য দিয়া বাহির হইয়া আসিল। সে যে বড় বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছিল, শঙ্করের জননী কখনও তাঁহাকে অনাদর করিতে পারিবেন না। হোসেন সানন্দে হেঁট হইয়া পিসিমাতাকে প্রণাম করিল। কিন্তু পদধূলি লইতে পারিল না। প্রথমবারের মত তাহার হাতখানি এবার আর স্বেচ্ছায় প্রসারিত হইল না।

পিসিমা দুইপদ পিছাইয়া গেলেন। একটা আশীর্ব্বচনও তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইল না।

তারাদেবী কহিলেন, "ঠাকুরঝি হোসেনকে আশীর্ব্বাদ করিলে না?"

পিসিমা একটু অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, "বাঁচিয়া থাক।" তারপর একটু থামিয়া কহিলেন, "এইবার বাড়ী যাও বাছা, কেহ দেখিলে [illegible]র্য্যায় কাণ্ড করিয়া বসিবে। দেখ বাছা, আজ যাহা করিয়া ফেলিয়াছ, তাহার উপর আর কোন হাত নেই, ফের যেন এমন কাজ করিও না। যাও বউ, রাত হইয়া যাইতেছে, আবার এই সব ত গোবরজল দিয়া ধুইয়া এই রাত্রে স্নান করিয়া আসিতে হইবে। এখনও দাঁড়াইয়া কেন?"

এময় সময় হোসেন কহিল, "তা হইলে মা জননী আমি এখন আসি।"

তারাদেবী কহিলেন, "সে কি হয়, মাকে প্রণাম করিয়া মিষ্টিমুখ না করিয়া কি যাইতে আছে। মার প্রসাদ না খাইয়া যাইতে পারিবে না। যা বাবা শঙ্কর, হোসেনকে লইয়া বাহিরের ঘরে বসগে, আমি খাবার লইয়া যাইতেছি।"

এই ঘটনা লইয়া পাড়াময় মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। পিসিমা তারাদেবীকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন যেন এই ঘটনা বাহিরের কেহ জানিতে না পারে; কিন্তু তিনিই প্রথমে যাহাকে দেখিলেন, তাহার নিকটে এ কথা প্রকাশ করিয়া দিয়া গোপন রাখিতে বলিলেন। এমনই এক পিসিমাতাই দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে দশ পনর জনের কাণে কাণে এ কথা বলিয়া দিলেন এবং প্রত্যেককে হাত ধরিয়া অনুরোধ করিলেন, "দেখ ভাই, এ কথা বাহিরে যেন না প্রকাশ পায়। তুমি ত আমাদের ঘরের লোক, তোমাকে বলিতে ত আর কোন বাধা নাই।"

যাহা হউক, কিছুদিন গ্রামের নিষ্কর্ম্মা লোকদিগের কর্ম্ম জুটিয়া গেল। তাহার ফল এই দাঁড়াইল যে, হোসেনের তারাদেবীর বাড়ী যাতায়াতের সম্মুখের পথ রুদ্ধ হইল। কিন্তু যেখানে অন্তরের টান আছে, সেখানে বাহিরের বন্ধন কি করিবে? হোসেন গভীর রাত্রে আসিয়া মাতৃপ্রসাদ খাইয়া যাইত। হায়, মাতৃপ্রসাদ লাভের জন্য তাহাকে চোরের মত যাওয়া আসা করিতে হইত!

হোসেন অনাথ, সে তাহার এক দূর সম্পর্কীয় খুল্লতাতের বাটী থাকিয়া কোন রকমে লেখপড়া শিখিতেছিল। যখন সে তৃতীয়শ্রেণী হইতে দ্বিতীয়শ্রেণীতে উঠিল সেই সময় ভিনগাঁয়ের ফতিমা নাম্নী এক একাদশ বর্ষীয়া বালিকার সহিত তাহার বিবাহ হয়, ফতিমার এক বুড়া মাতামহী ছাড়া আর কেহ ছিল না। মাতামহীর কিছু জমিজমা ছিল, তাহাতে

বেশ স্বচ্ছন্দে তাহাদের দিনপাত হইত। বৃদ্ধা অনেক অনুসন্ধান করিয়া হোসেনকে গৃহজামাতারূপে বরণ করিয়া আনিলেন। জনকজননী হারাইবার পর সে এতদিন আত্মীয়ের বাড়ী যে তাচ্ছিল্য ও অবহেলায় মধ্যে দিন কাটাইতেছিল বৃদ্ধার অজস্র স্নেহযত্ন পাইয়া সে সত্যই নির্ম্মল আনন্দ অনুভব করিল।

তাহার পর একটু একটু করিয়া শঙ্করের সহিত যখন তাহার বন্ধুত্ব জমিয়া উঠিল, তখন তাহার মনে হইল,সংসার কেবলই দুঃখময় নহে।

২

বৎসরখানিক পরে এক রাত্রে মাতৃপ্রসাদ পাইবার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়া শুনিল, শঙ্করের ওলাউঠা হইয়াছে। বার দুই ভেদবমির পর সে একেবারে শয্যাগ্রহণ করিয়াছে। তারাদেবী দুই চারিজন পাড়া-প্রতিবাসীকে ডাকিয়া আনিয়া কি করা যায়,তাহারই পরামর্শ গ্রহণ করিতে ব্যস্ত আছেন। গ্রামে যে একজন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ছিলেন, তিনি গোটা ত্রিশেক শিশিপূর্ণ ধূলিসমাচ্ছন্ন কাঠের বাক্স লইয়া উপস্থিত হইয়া ঔষধ খাওয়াইয়া আশ্বাস দিয়া বলিতেছিলেন, "যাহা দিলাম, এ একেবারে অব্যর্থ।" কিন্তু পীড়া উপশমের কোন লক্ষণই দেখা গেল না। তারাদেবী অত্যন্ত উৎকন্ঠিতা হইয়া উঠিলেন। গ্রামে আর ডাক্তার নাই। সহর এইখান হইতে চারি ক্রোশের উপর, সেখানে গেলে ডাক্তার পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু বনজঙ্গলের মধ্য দিয়া রাত্রিকালে সহরে যাইতে কেহ রাজি হইল না। গ্রামের ডাক্তার সাহস দিয়া বলিতে লাগিলেন, "ভয় কি গো আর দুই ডোজ পড়িলেই শঙ্কর উঠিয়া বসিবে।" কিন্তু জননীর মন বুঝিল না। তাঁহার একবার ইচ্ছা হইতে লাগিল, তিনি নিজেই ডাক্তার আনিতে ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়েন। এমন সময় তিনি উঠানের দিকে

চাহিয়া দেখিলেন, একজন অন্ধকারের মধ্যে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তিনি ডাকিলেন, বাবা হোসেন! তাঁহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল। হোসেন কম্পিত হৃদয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া আসিয়া দূর হইতে জননীকে প্রণাম করিয়া কহিল, "কি হইয়াছে মা, তুমি কাঁদিতেছ কেন?"

তারাদেবী চোখের জলে বুক ভাসাইয়া কহিলেন, "বাবা, তোমার শঙ্করকে বুঝি আমি রক্ষা করিতে পারিলাম না। সর্ব্বনেশে ওলাউঠা বাছাকে গ্রাস করিতে বসিয়াছে। ডাক্তার দেখাইব তাহার উপায় নাই, এ রাত্রে কে সহরে গিয়া ডাক্তার ডাকিয়া আনিবে—যে রাস্তায় বাঘ-ভালুকের ভয়।"

হোসেন ব্যস্ত হইয়া কহিল, "মা তার জন্য ভাবিতেছ কেন? আমি এখনই ডাক্তার ডাকিয়া আনিতেছি—তোমার আশীর্ব্বাদে বাঘ ভালুক আমার কিছুই করিতে পারিবে না। ডাক্তার আসিলে শঙ্কর নিশ্চয়ই সারিয়া উঠিবে। মা তুমি কিছু ভাবিও না।" এই বলিয়া হোসেন জননীকে আবার প্রণাম করিয়া সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া অগ্রসর হইল।

তারাদেবী ব্যগ্র হইয়া কহিলেন, "হোসেন কাউকে সঙ্গে লইয়া যাও। এই অন্ধকারে বন জঙ্গলের মধ্য দিয়া একলা যাইও না; লক্ষী বাবা আমার, এ বিপদের উপর বিপদ বাড়াইও না।"

হোসেন তখন উঠান প্রায় পার হয়-হয় হইয়াছে; সেইখানে দাঁড়াইয়া কহিল, "মা কিছু ভাবিবেন না—আমি শীঘ্রই ডাক্তার লইয়া ফিরিয়া আসিব।"

এই কথা বলিয়া বাহিরে যাইতে উদ্যত হইলে তারাদেবী কহিলেন, "তবে কিছু মুখে দিয়ে যাও বাবা, তোমার যে আজ এখানে নিমন্ত্রণ ছিল।"

হোসেন ব্যথিত কণ্ঠে কহিল, "মা, শম্ভু ভাল হইয়া উঠুক, এক সঙ্গে বসিয়া তোমার প্রসাদ খাইব—একলা আমি খাইতে পারিব না।" এই বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

তারাদেবী চোখের জল মুছিতে মুছিতে পীড়িত পুত্রের শিয়রে গিয়া বসিলেন।

ভোর রাত্রে হোসেন ডাক্তার লইয়া উপস্থিত হইয়া ডাকিল, "মা মা।"

তিন চারি জন আত্মীয়কুটুম্ব অনুগ্রহ করিয়া সেদিন রোগীর শুশ্রূষা করিতেছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে দুই জন বাহিরে আসিয়া সঙ্গে করিয়া ডাক্তারকে ভিতরে লইয়া যাইতেছিলেন; হোসেনও তাঁহা-দের পিছন পিছন সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতে যাইতেছিল; এমন সময়ে কে একজন চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "দেখেছ মুসলমান ছোঁড়াটার স্পর্দ্ধা, সে কি না ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, যা যা বাহির হইয়া যা। অত বাড়াবাড়িতে কাজ নাই।"

সর্পদষ্ট ব্যক্তির মত হোসেন সহসা পিছাইয়া গেল। সে মুসলমান, ব্রাহ্মণের কক্ষের মধ্যে যে তাহার প্রবেশ নিষেধ!

তারাদেবীর বুক ফাটিয়া গেলেও তিনি ইহার প্রতীকার করিতে পারি-লেন না। তিনি জানিতেন, এই নিষ্ঠুর আত্মীয়কুটুম্বেরা এখনই তাঁহার গৃহ ত্যাগ করিয়া যাইবে।

ডাক্তার গেলে, তারাদেবী বাহিরে গিয়া দেখিলেন, হোসেন ব্যাকুল নয়নে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া নিঃশব্দে উঠানের এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া আছে। তাঁহাকে দেখিয়া সে ব্যগ্র হইয়া প্রশ্ন করিল, "মা ডাক্তারবাবু কি বলিয়া গেলেন?"

তারাদেবী রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "বাবা :ডাক্তার বাবু বলিলেন, কোন

ভয় নাই। কিন্তু তিনি যাই বলুন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভগবান্ তোমার মুখ চাহিয়া শঙ্করকে রক্ষা করিবেন! বাবা তুমি না করিলে—"

হোসেন বাধা দিয়া কহিল, "মা আমি কি তোমার ছেলে নহি—"

তারাদেবী কহিলেন, "যাও বাবা তুমি বাড়ী গিয়া কিছু খাইয়া এস।"

হোসেন অবনতমস্তকে তাহার আজ্ঞা পালন করিল। সে বুঝিল, জননী অন্তরের কতখানি ব্যথা চাপিয়া এ আদেশ করিয়াছেন। কিন্তু পথে যাইতে যাইতে শঙ্করকে দেখিবার জন্য তাহার অন্তর হাহাকার করিতে লাগিল। কিন্তু কোন উপায় নাই—সে যে মুসলমান, ব্রাহ্মণের কক্ষে কোন সময়েই তাহার প্রবেশের অধিকার নাই!

মধ্যাহ্নে হোসেন শঙ্করের কক্ষের জানালার দিকে চাহিয়া বাহিরে ঘাসের উপর বসিয়াছিল। এমন সময় কে একজন হাতছানি দিয়া তাহাকে ডাকিতে সে কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া জানালার নিকট যাইতেই সেই লোকটি কহিল, "দেখ গ্রামের বাহিরে যে পুকুর আছে, সেই পুকুর হইতে এই কাপড়চোপড়গুলো কাচিয়া লইয়া আয় দিকি। শুধু বসিয়া থাকিলে কি হইবে। বন্ধু বলিয়া ডাকিয়া ব্রাহ্মণের জাত মারিবার চেষ্টা করার চেয়ে, এই উপকারটুকু কর দেখি।"

হোসেন সাগ্রহে কহিল, "কই কাপড়চোপড়গুলো আমায় দিন, আমি এখনই কাচিয়া আনিতেছি। শঙ্কু এখন কেমন আছে?"

লোকটি তাচ্ছিল্যভরে কহিল, "বেশ আছে, তোকে যা বলিলাম তাই করিয়া আয় দেখি, বুঝিব তুই কেমন বাহাদুর ছেলে।" তারপর তারা-দেবীকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "দাও না বউঠাকরুণ কাপড়গুলো জানালা দিয়া ফেলিয়া; ওই মোছলমান ছোড়াটিকে দিয়া কাচাইয়া আনি, ওকে দিয়া ত আর কোন কাজ করান যাইবে না।

তারাদেবী স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন! তাঁহার অন্তর বিদ্রোহী হইয়া উঠিতে চাহিল, শুধু এই আসন্ন বিপদকালে সমাজের মুখ চাহিয়া তিনি বিদ্রোহ দমন করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু হোসেনের হাতে তিনি সে কাপড়গুলো কিছুতেই তুলিয়া দিতে পারিলেন না। তিনি মনে মনে কহিলেন, হায়, মানুষ কি করিয়া এমন অন্ধ হয়! যাহারা ওলাউঠার ভয়ে দূরে থাকিয়া কেবল চক্ষুলজ্জার খাতিরে কম্পিত হস্তে জলের গেলাস বা ঔষধের পাত্রটি আগাইয়া দিতেছেন,তাহারা কোন্ প্রাণে পরের বাছাকে দিয়া এই ভেদবমিমাখা কাপড়গুলো কাচাইবার জন্য এত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন! প্রকাশ্যে কহিলেন, "ওসব আমি নিজে গিয়া রাত্রে কাচিয়া আনিব। পরের বাছাকে দিয়া আমি কখনও এমন কাজ করাইতে পারিব না।"

(৩)

ভগবানের আশীর্ব্বাদে ও হোসেনের একান্ত প্রার্থনায় শঙ্কর বাঁচিয়া উঠিয়াছে। এই ঘটনার পর প্রায় বৎসর তিনেক অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। শঙ্কর ও হোসেন দুইজনই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতার কলেজে পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। পরীক্ষার ফল বাহির হইলে দেখা গেল, দুই জনেই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। সে দিন দুই বন্ধুর কি আনন্দেই না কাটিল। দেখিতে দেখিতে আবার কলিকাতায় ফিরিবার সময় আসিল। এমন সময় বিনা মেঘে সহসা বজ্রপাত হইল। পরপর তিনদিনে হোসেনের সাধ্বী পত্নী ফতিমা, ফতিমার বৃদ্ধা মাতামহী, অবশেষে হোসেন, দারুণ বিসূচিকা রোগে প্রাণত্যাগ করিল। মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে হোসেন তাহার স্নেহের দুলাল একমাত্র কন্যা আনেষাকে শঙ্করের কোলে দিয়া বলিয়া গেল, "ভাই, মুসলমান হইলেও আমার

দুলালীকে তোর গৃহে স্থান দিস্। তুই, আর মা জননী ছাড়া আমার দুলালীর আর কেহ রহিল না। দেখিস্ ভাই, তাহাকে ফেলিয়া দিস্ না।” পিতার পাণ্ডুর মুখের দিকে চাহিয়া ভীত হইয়া আনেষা শঙ্করের গলা জড়াইয়া ধরিয়া ডাকিল. “জ্যাঠা, জ্যাঠা।”

শঙ্কর কম্পিত বাহুদ্বয় দিয়া তাহাকে বুকের সঙ্গে চাপিয়া ধরিয়া নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

আনেষাকে বুকে করিয়া সে তাহার গৃহদ্বারে আসিয়া দেখিল, তাহার জননী ব্যগ্রনয়নে পথপানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। জননীকে দেখিয়া সে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, “মা হোসেনও আমাদের ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।” আর কিছু সে বলিতে পারিল না। শিশু আনেষাও কাঁদিতে লাগিল। সে কেবলই দুই হাতে শঙ্করের মুখ ধরিয়া বলিতে লাগিল, “জ্যাঠা জ্যাঠা, বাবার কাছে যাব—বাবার কাছে যাব।” শঙ্কর তাহাকে কি বলিয়া সান্ত্বনা দিবে, সে নিজেই কাঁদিয়া আকুল হইয়া পড়িল।

তারপর সেইভাবে কাদিতে কাঁদিতে কহিল, “মা হোসেন যে ইহাকে আমার হাতে দিয়া গিয়াছে, আমাদের বাড়ীতে একটু স্থান দিতে বলিয়াছে।”

তারাদেবীরও চোখের জলে বুক ভাসিয়া যাইতেছিল। তিনি কাতর-কণ্ঠে ভগবানকে ডাকিয়া বলিলেন, “এ কি পরীক্ষায় ফেলিলে ঠাকুর!”

এমন সময় দেখিতে দেখিতে সমাজের ঘুমন্ত পাণ্ডারা সহসা জাগিয়া উঠিল এবং তারাদেবী ও শঙ্করের চতুস্পার্শ্বে আসিয়া জমা হইতে লাগিল। কাকের মুখে যেন সারা গ্রামময় এ সংবাদ প্রচারিত হইয়া গিয়াছিল। প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া সকলে তারাদেবীকে বিব্রত করিয়া তুলিতে লাগিল। “হাঁ গো চাটুয্যে গিন্নি, তুমি নাকি এই মুসলমানের মেয়েটাকে

বাড়ীতে রাখিবে?" কেহ কেহ বলিতে লাগিল, "টাকার লোভটা কি জাতধর্ম্মের চেয়ে এতই বড় হইল যে, টাকার লোভে একটা মোছলমানের মেয়ে পুষিবে।" ইত্যাদি ইত্যাদি। তারাদেবী নিরুত্তরে সমস্ত সহ্য করিয়া গেলেন। হোসেন যে তাঁহার শঙ্করের ভাইয়ের মত ছিল, তাহা যে কাহাকে বুঝাইবার উপায় তাঁহার ছিল না। এই সমস্ত লোকের হৃদয়ের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতর সে কথা যে কিছুতেই প্রবেশ করিতে পারিবে না। আহা, এই সময়ে যে সেই হোসেনের মেয়ে!—যে একদিন জীবন তুচ্ছ করিয়া তাঁহার শঙ্করের প্রাণরক্ষা করিয়াছে, উঠানে বসিয়া দীনদুঃখীর মত তাঁহার প্রসাদ খাইয়াছে; বাড়ীর নানাবিধ অন্ন-ব্যঞ্জন ফেলিয়া কলার পাত পাতিয়া কত আনন্দে সে মহাপ্রসাদের মত তাঁহার পাতের অন্ন খাইয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছে। গভীর রাত্রে চোরের মত আসিয়া তাঁহার পদধূলি লইয়া গিয়াছে। বিপদ আপদে বুক পাতিয়া দিয়াছে। তখন কোথায় ছিল, এই সমস্ত আত্মীয়কুটুম্ব, এই সমস্ত দরদী প্রতিবেশী, একবারও ত কেহ ফিরিয়াও দেখে নাই। আজ সবাই এই ক্ষুদ্র বালিকাটির বিরুদ্ধে কোমর বাঁধিয়া আসিয়াছে। হায় ভগবান্, সে এখন কি করিবে? এই সমস্ত হৃদয়হীন লোকের ভয়ে তাহার হোসেনের আদরের দুলালীকে কি করিয়া দূর করিয়া দিবে?

অবশেষে সমাজেরই জয় হইল, অপেক্ষাকৃত বিজ্ঞগণের পরামর্শমত পিতৃমাতৃহীন অনাথাকে গ্রামেরই এক মুসলমানের গৃহে রাখাই স্থির হইল। আনেষার খোরপোষের জন্য একটা মাসহারা সাব্যস্ত করিয়া দেওয়া হইল। শঙ্কর কেবল জননীর মুখ চাহিয়া, এই নিষ্ঠুর চরিত্রহীন লোকদের সমস্ত অত্যাচার নীরবে সহ্য করিল। এক একবার তাহার ইচ্ছা হইল, এই হৃদয়হীন সমাজের সহিত সে সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিবে। কিন্তু

তাহা পারিল না; রুদ্ধবীর্য্য সর্পের মত অন্তরে অন্তরে গর্জ্জন করিতে লাগিল।

(৪)

ভগ্নহৃদয়ে শঙ্কর কলিকাতায় ফিরিয়া গেল। যথানিয়মে সে বি, এ ক্লাশে ভর্ত্তি হইল কিন্তু তাহার দগ্ধ অন্তরের জ্বালার এতটুকু উপশম হইল না। হোসেন যে তাহার নিত্য সহচর ছিল, সুখে দুঃখে, আমোদে আহ্লাদে সেই যে তাহার একমাত্র সুহৃদ্ ছিল। ক্লাশে বসিয়া মাঝে মাঝে শঙ্করের সমস্ত ভুল হইয়া যাইত। তাহার বোধ হইত, হোসেন যেন তাহার পাশে বসিয়া আছে। সে ভ্রমক্রমে মাঝে মাঝে এক জনের হাত ধরিয়া ডাকিয়া ফেলিত, হোসেন! সেই অপরিচিত ছাত্রটির সকৌতুক সশব্দ হাস্যে তাহার ভুল ভাঙ্গিয়া যাইত। বিকালে কলেজের পর সে কোথাও বেড়াইতে যাইত না, চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত। রাত্রে ঘুমের ঘোরে চমকিয়া উঠিয়া বসিয়া চারিদিকে সে চাহিয়া দেখিত; ঐ যে কে কাঁদ কাঁদ স্বরে 'জ্যাঠা জ্যাঠা' বলিয়া ডাকিতেছে না? কিন্তু কোথায় কে? শুধু তাহার চারিদিকে কঠিন প্রাচীরগুলা যেন নির্ম্মম হৃদয়হীন লোকের মত তাহার দিকে চাহিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিত। সে বুক চাপিয়া ধরিয়া শয্যার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া থাকিত, ঘুম আর আসিত না।

সপ্তাহে দুই দিন করিয়া সে করিমের নিকট হইতে পত্র পাইত। পড়িতে পড়িতে কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার দুই চক্ষু লাল হইয়া উঠিত। প্রতি-পত্রেই লিখিত, "মেয়েটাকে কিছুতেই রাখিতে পারিতেছি না, সে কেবল মা-বাবা-জ্যাঠা বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া সকলকে অস্থির করিতেছে, যাহা হয় ব্যবস্থা কর, আমি আর রাখিতে পারিতেছি না ছোট্ ঠাকুর।"

শঙ্কর তাহাকে কত অনুনয় বিনয় করিয়া উত্তর দিত, করিম মেয়েটিকে যত্ন করিও, তাহা হইলে সে আর কাঁদিবে না। তাকে বুঝাইও তার জ্যাঠা শীঘ্রই গিয়া তাহাকে দেখিয়া আসিবে।"

শঙ্কর মাকে একদিন লিখিল, "মা কি করি, আনেষার ভাবনায় আমার পড়াশুনা কিছুই হইতেছে না, কেবলই যেন তাহার কান্নার শব্দ শুনিতে পাইতেছি। যখনই বই খুলিয়া পড়িতে বসি, তখনই হোসেন যেন আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া তাহার শেষ অনুরোধের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়। মা আর সহ্য করিতে পরিতেছি না।"

জননী উত্তরে লিখিলেন, "বাবা আমারও জপ তপ প্রায়ই রাত্রে হইয়া যাইতেছে। বুকের মধ্যে কেমন করিয়া ওঠে, আর সব ভুলিয়া যাই। মনে হয় ভগবান্ যেন আমাদের নিষ্ঠুর আচরণ দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। আহা বাপ-মা-মরা মেয়েটার কি দুর্গতিই না হইতেছে। নিষ্ঠুর সমাজের ভয়ে রাক্ষসী সাজিতে হইয়াছে। কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। সহ্য করিয়া থাক বাবা,—যতটা পার সহ্য করিয়া থাক।"

পনর দিন পরে করিমের যে পত্রখানি আসিল, সেখানি পড়িয়া শঙ্করের সর্ব্বদেহ থর্‌থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, করিম লিখিয়াছে, "এই আমার শেষ পত্র, আমি কি শেষে পরের মেয়ের জন্য বিপদে পড়িব। সে কাঁদিয়া কাঁদিয়া জ্বর বাধাইয়া বসিয়াছে। এমনই দেহের উত্তাপ যে হাত দেওয়া যায় না। তাহার উপর মেয়েটা এমনই আহ্লাদে যে, কিছুতেই বিছানায় থাকিবে না; তাহাকে কোলে করিয়া রাখিতে হইবে। তাহার দেহের উত্তাপে আমাদের দেহ ঝলসিয়া যাইতেছে। আমার শেষ কথা, আমি আজই মেয়েটাকে তোমাদের বাড়ী ফেলিয়া দিয়া আসিব, তোমার মাঠাকুরুণ যাহা হয় ব্যবস্থা করিবেন। মেয়েটার চেহারা দেখিলে ভয়

হয়। দুই চোক লাল টকটক্ করিতেছে, সে কেবল 'জ্যাঠা জ্যাঠা' বলিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছে। পরের বোঝা আর আমি বহিব না, জানিও।" খানিকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিয়া শঙ্কর দ্রুতপদে উপরে চলিয়া গেল এবং পরক্ষণেই ষ্টেশনাভিমুখে ধাবিত হইল।

ঠিক সন্ধ্যাকালে শঙ্কর গৃহদ্বারে পৌঁছিয়া দেখিল, গৃহ বহুলোকে পরিপূর্ণ, এবং করিম আনেষাকে ধরিয়া দাঁড়াইয়া গর্জ্জন করিতেছে—"আমি আর কিছুতেই রাখিতে পারিব না—আপনারা যাহা ভাল বোঝেন করুন। হাঁসপাতালে হ'ক, অনাথ-আশ্রমে হ'ক, যেখানে ইচ্ছা আপনারা পাঠাইতে পারেন। আমি পৌঁছাইয়া দিয়াছি আর আমার কোন দায়িত্ব নাই।" করিম ধরিয়া থাকা সত্ত্বেও পিতৃমাতৃহীনা আনেষা প্রবল জ্বরের তাড়নে সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছে না। তাহার ক্ষুদ্র মস্তকটি বার বার সামনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে। তাহারই অদূরে শঙ্করের জননী তারাদেবী আশু প্রলয়বাহী নভোমণ্ডলের মত গম্ভীর নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

করিম শঙ্করকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "এই যে ছোট্ঠাকুর আসিয়াছে, ভালই হইয়াছে। নাও গো ছোট্ঠাকুর, তোমার মেয়ে নাও। খুব আপদ আমার ঘাড়ে চাপাইয়াছিলে যাহা হউক। চাটুয্যে, মুখুয্যে মহাশয়েরা হাঁসপাতালে বা অনাথ-আশ্রমে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিতে চাহিয়াছেন, তাই করুন, সব গোল চুকিয়া যাইবে।" এই বলিয়া করিম আনেষাকে ধরিয়া রোয়াকের উপর শোয়াইয়া দিল। আনেষা বাবা-মা-জ্যাঠা বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু জ্বর-জর্জ্জরিত দেহ লইয়া উঠিতে পারিল না, সেইখানে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

এমন সময় সমাজের জনৈক নেতা অগ্রসর হইয়া বলিল, "এই যে

শঙ্কর! দেখ করিম যখন রাখিতে চাহিতেছে না, তখন মেয়েটাকে হাস-পাতালেই পাঠাইয়া দাও।”

অপর একজন বলিল, “না হে, অনাথ-আশ্রমে পাঠাইয়া দাও, সেখানে মেয়েটা থাকিবে ভাল।”

শঙ্করের হৃদয়ের ঝড়ের বেগের সম্মুখে ক্ষুদ্র কুটিতৃণের মত তাহাদের সমস্ত উপদেশ কোথায় উড়িয়া গেল। সে কোন দিকে না চাহিয়া, দুই বাহু বাড়াইয়া আনেষাকে বুকের মধ্যে তুলিয়া লইল। আনেষা তাহার মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া ডাকিল, “জ্যাঠা।” ক্ষুদ্র বালিকা তাহার এই একটা কথার মধ্য দিয়া তাহার অন্তরের সমস্ত কাতর নিবেদন যেন শঙ্করের সম্মুখে উজাড় করিয়া দিল।

শঙ্কর ডাকিল, “মা!”

তারাদেবী দৃপ্তকণ্ঠে কহিলেন, “শঙ্কর আর সহ্য করিতে পারিব না। এখনও যে সমাজ এই রোগক্লিষ্টা শিশুকে ত্যাগ করিতে পরামর্শ দেয়, সে সমাজ আমাদের একঘরে করিলে দেবতার আশীর্ব্বাদের মতই তাহা গ্রহণ করিব। আর কাহারও মুখ চাহিব না। নিয়ে চল বাছাকে আমার শোবার ঘরে, আমি নিজে আনেষার সেবা করিব। সে আমাদেরই মেয়ে হইয়া থাকিবে। হৃদয়হীন সমাজ যাহা করিতে পারে করুক।”

শঙ্কর খুকীকে বুকে করিয়া মহানন্দে ভিতরে চলিয়া গেল।

মেয়ের বাপ

বিশ্বেশ্বর মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া প্রতি মাসের প্রথমে যাহা পারিশ্রমিক পাইত, তাহাতে কোন রকমে কায়ক্লেশে তাহাদের দিনগুলা কাটিয়া যাইত। পরিবারের মধ্যে তাঁহার পত্নী মাধুরী এবং দুইটী কন্যা,—সুধা ও হাসি। সুধা বার বৎসরের, হাসি পাঁচ বৎসরের। পৈত্রিক সম্পত্তির মধ্যে দোচালা একখানি ঘর, রাঁধিবার একখানি ছোট চালা ও ঐ গৃহসংলগ্ন বিঘা পাঁচেক জমি। বিশ্বেশ্বর ডেলি-প্যাসেঞ্জার, প্রতিদিন বেলা আটটার সময় ডাল ও শাকভাজা দিয়া ভাত খাইয়া ট্রেণ ধরিয়া কলিকাতায় আপিস করিতে যাইত, সন্ধ্যা সাতটার সময় অবসন্নদেহে গৃহে ফিরিয়া আসিত।

সেদিন সন্ধ্যার সময় সুধা ও হাসি পিতার অপেক্ষায় পথ চাহিয়া বাহিরের রোয়াকে দাঁড়াইয়া ছিল, মাধুরাদেবী প্রতিদিনের মত রান্নাঘরে বসিয়া স্বামীর জন্য অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতেছিল—সেই কোন্ সকালে তাহার স্বামী দু'টী ভাত মুখে গুঁজিয়া বাহির হইয়াছেন!

তখন সূর্য্যদেব তাঁহার সমস্ত উগ্রকিরণ সংবরণ করিয়া শান্তজ্যোতি-

বিভূষিত হইয়া পশ্চিম আকাশের প্রান্ত ডিঙাইয়া বিশ্রাম করিতে চলিয়া গিয়াছেন; আপিসের বাবুরা শ্রান্তপদে একে একে কলিকাতা হইতে গৃহে ফিরিতে আরম্ভ করিয়াছে!

রোয়াক হইতে হাসি গলা বাড়াইয়া কহিল, "ঐ যে দিদি, বাবা আস্ছে," বলিয়া সে ছুটিয়া গিয়া বিশ্বেশ্বরের হাত চাপিয়া ধরিল। সুধা রোয়াকেই স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

বিশ্বেশ্বর হাসিকে কোলে তুলিয়া লইয়া কহিল, "এই দেখ্ আজ কি এনেছি।"

হাসি রুমালে বাঁধা ছোট পুঁটুলিটি হাতে লইয়া মহাখুসী হইয়া সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "কি বাবা এতে?"

বিশ্বেশ্বর কহিল, "তা' এখন বল্ব না।"

হাসির ঔৎসুক্য আরও বাড়িয়া গেল, সে ব্যগ্র হইয়া বলিয়া উঠিল, "বল না বাবা, কি ওতে?"

পিতা হাসিয়া বলিলেন, "নিচু রে নিচু!"

তখন তাঁহারা রোয়াকের সম্মুখে আসিয়া পৌছিয়াছেন। হাসি তাড়াতাড়ি কোল হইতে নামিয়া পড়িয়া নিচুর পুঁটুলিটি হাতে লইয়া রান্নাঘরের অভিমুখে ছুটিল। বিশ্বেশ্বর হাসিয়া বলিল,—"দেখ্লি মা সুধা, ও কেমন দুষ্টু সবগুলো নিয়ে ওর মা'কে দিতে গেল, তোকে দিয়ে গেল না।"

সুধাও মধুর হাসি হাসিয়া বলিল,—"বোন্টি বাবা আমায় না দিয়ে কিছু খায় না, তুমি দেখ বাবা।"

সুধার হাত ধরিয়া রান্নাঘরের সম্মুখে দাঁড়াইতেই মাধুরী বলিয়া উঠিল, "ও নিচুগুলো কত নিলে গা?"

বিশ্বেশ্বর বলিল, "চার আনা,—আট আনা করে শ, বেশ সস্তা না?"

মাধুরী বলিল,—"হাঁ। সস্তা,—নিচুগুলো বেশ বড়—তা' পঞ্চাশটা না কিন্‌লেও হ'ত।"

বিশ্বেশ্বর হাসিয়া বলিল,—"তা হ'লে শুধু মেয়েদেরই হ'ত, তোমার ভাগ্যে ত কিছু জুট্‌ত না।"

মাধুরী বাধা দিয়া বলিল,—"তোমার যেমন কথা, আমার আর নিচু খেয়ে কাজ নেই। তার চেয়ে তুমি যদি আর দু' আনার মাছ আন্‌তে তা হ'লে দু'টী বেশী ভাত পেটে যেত। কৈ' মাছ কোথায় রাখ্‌লে—আমি আলু পটল সাঁতলে রেখেছি, মাছ ক'টা কুটেই ঝোল্‌টা চড়িয়ে দেব। তুমি মুখ হাত ধুয়ে আস্‌তে আস্‌তেই ঝোল নেমে যাবে'খন।"

বিশ্বেশ্বর মৃদু হাসিয়া বলিল,—"ঐ যা, মাছ আন্‌তে ভুলে গেছি।"

মাধুরী দুঃখিত হইয়া বলিল,—"এমন ভোলা কিন্তু তোমার ভারি অন্যায়, কি দিয়ে ভাত দি বল দিকি, যাওয়ার সময় তোমার হাতে দু' আনা পয়সা দিয়ে এত ক'রে বলে দিলাম, তবুও ভুলে গেলে।" তার পর একটু থামিয়া আবার বলিল,—"না তোমার মিছে কথা, তুমি ভোল নি, ঐ পয়সা দিয়ে নিশ্চয়ই নিচু কিনে এনেছ,—সত্যি ক'রে বল দিকি ?"

বিশ্বেশ্বর তৃপ্তির হাসি হাসিয়া বলিল,—"সত্যি তাই! আমার কাছে মোটে দু' আনা ছিল, মাছের দু' আনা দিয়ে তবে ত পঞ্চাশটা নিচু কিন্‌লাম।"

মাধুরী অনুযোগের স্বরে বলিল,- "এ তোমার ভারি অন্যায়—পঁচিশটা আন্‌লেই ঢের হ'ত।"

বিশ্বেশ্বর বলিল, "নিচুগুলো পেয়ে ওদের কি আহ্লাদ হয়েছে দেখ দিকি, এর চেয়ে কি মাছ খেয়ে আমি বেশী সুখ পেতাম।"

সেদিন রাত্রে বিশ্বেশ্বর মাধুরীকে বলিল,—"হাসি যে দুটো নিচু হাতে করেই ঘুমিয়ে পড়েছে। আর তুমি বল্‌ছিলে মাছ আন্‌লে না কেন ?"

তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া আবার বলিল,—"বছরকার দিন ছুটো ভাল আম নিচু এনে যে খাওয়াব, সে সংস্থান আমার নেই, আপিস থেকে ফের্বার সময় কত লোক তা'দের ছেলে-মেয়েদের জন্যে কত খাবার জিনিস আনে।"

বিশ্বেশ্বর এই কথা বলিল বটে, কিন্তু কাজে সে অন্যরূপ করিত। প্রতিদিনই সে তাহার মেয়ে দু'টীর জন্য কিছু না কিছু আনিতই।

সেদিন রবিবার, বিশ্বেশ্বর সুধাকে ডাকিয়া বলিল,—"মা, সেই গানটা একবার গাও ত?"

সুধা হারমনিয়ম লইয়া গান গাহিতে বসিল। হাসিকে কোলের উপর বসাইয়া বিশ্বেশ্বর তন্ময় হইয়া কন্যার মধুরকণ্ঠনিঃসৃত গীতধ্বনি শুনিতে লাগিল; তাহার বোধ হইতে লাগিল, এ সংসারে আবার দুঃখ কোথায়! দীর্ঘজীবনের মধ্যে হয় ত এমন একটা দিন আসে, যখন অতি দুঃখীরও একবারও মনে হয়, পৃথিবীতে বুঝি কোন দুঃখ কষ্ট নাই! বিশ্বেশ্বর নিজে ভাল গায়িতে ও বাজাইতে পারিত, সে বড় মেয়ে সুধাকেও যত্ন করিয়া গানবাজনা শিখাইয়াছে।

সোমবার দিন আপিস যাইবার সময় সুধা পিতাকে বলিল,-"বাবা আর এক গজ লংক্লথ নিয়ে এস না, বোন্‌টির আর দুটো ইজের সেলাই করে দেব। কাল ফ্রক দুটো শেষ হয়ে গেছে,—গায়ে ঠিক হয় নি বাবা?"

বিশ্বেশ্বর হাসিয়া বলিল,—"খুব ভাল হয়েছে, গায়েও বেশ মানিয়েছে দোকানের জামাও অত ভাল হয় না।"

সুধা মুখটি নিচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। "আজ তোমার লংক্লথ আস্‌বে'খন" বলিয়া বিশ্বেশ্বর চলিয়া গেল।

আপিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, হাসির অল্প অল্প জ্বর হইয়াছে,

সে সারা দেহ একখানি চাদরে মুড়িয়া সুধার কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া আছে। স্বামীর পদশব্দ শুনিয়া মাধুরী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। বিশ্বেশ্বর উৎকণ্ঠিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাসির বুঝি খুব জ্বর হয়েছে ?"

মাধুরী বলিল,—"গা'টা গরম হয়েছে বটে, কিন্তু জ্বরটা খুব বেশী হয় নি। কালকের ঠাণ্ডা লেগে বোধ হয় জ্বরটা হয়েছে—ও সেরে যাবে'খন।"

বিশ্বেশ্বর ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল,—"না না এখন দিন কাল ভাল না, যাই ডাক্তারবাবুকে নিয়ে এসে একটা যাহ'ক ওষুধের ব্যবস্থা ক'রিয়ে নি। হাসি ঘুমিয়ে পড়েছে, চট্ করে ঘুরে আসি।"

মাধুরী বলিল,—"তুমি একটুতে ভারি ব্যস্ত হয়ে পড়। সবে ত আজ দুপুরবেলা জ্বর হয়েছে, রাতটা দেখ, সকালে জ্বর যদি না ছাড়ে, তখন যাহ'ক একটা ব্যবস্থা ক'র ; এখন হাত মুখ ধুয়ে একটু ঠাণ্ডা হও।"

বিশ্বেশ্বর সে কথায় কাণ না দিয়া সেই আপিসের পোষাকেই ডাক্তার ডাকিতে চলিয়া গেল।

* * * * * *

মাস ছয়েক পরে এক রবিবারে আপিসে বাবুরা গ্রামের বাজারে গিয়া ভিড় করিয়াছেন। যে জিনিসটা অন্য দিন দুই পয়সায় বিক্রয় হইত সেদিন তাহা তিন পয়সার কমে বিক্রয় হইত না। দোকানদার ছয় পয়সা দাম হাঁকিত, বাবুরা অনেক কাকুতিমিনতি ও বাক্যব্যয় করিয়া সেটিকে তিন পয়সায় খরিদ করিয়া মহা প্রফুল্লচিত্তে বাটী ফিরিত।

মুদিখানার সম্মুখে একটী কেরোসিন কাঠের বাক্সের উপর বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে বিশ্বেশ্বর তাহার বন্ধুবর্গের সহিত মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

রাইচরণ বলিল,—"ওহে ভায়া, সংসারটাকে এখনও মোটেই চেন নি,

তাই ও কথা বল্‌ছ। যতই গান বাজনা, আর লেখাপড়া শেখাও না কেন, আমাদের দেশের ভবিরা ভোল্‌বার নয়।"

বিশ্বেশ্বর হুঁকাটি শ্যামাচরণের হাতে দিয়া বলিল, "তোমার ও কথা রাইদা কিন্তু আমি কিছুতেই মেনে নিতে পার্‌লাম না। সব মানুষই কি সমান হয়, কেউ বা টাকা খোঁজে, কেউ বা মেয়ে খোঁজে।"

রাইচরণ বলিল, "দেখ ভায়া, তুমি যা বল্‌চ সে কথাটা খুব ঠিক, তবে এখনকার সংসারে ও রকম বিনে টাকায় মেয়ে নেবার লোক খুঁজতে খুঁজতে বছরের পর বছর কেটে যাবে, তবু মিল্‌বে কি না সন্দেহ!"

বিশ্বেশ্বর বলিল, "তোমরা সকলেই ঐ কথাই বলে থাক, কিন্তু আমি খবরের কাগজে প্রায়ই দেখতে পাই, 'অমুক তাঁহার ছেলের বিয়ের সময় এক পয়সাও নেয় নি' কাগজেও তাঁ'দের কত প্রশংসা বেরোয়।"

রাইচরণ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বিশ্বেশ্বর একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল,—"অমন করে হেসে উঠলে যে রাইদা?"

রাইচরণ হাসির বেগ সংবরণ করিয়া বলিল,—"তাই ত একটু আগেই তোমাকে বল্‌ছিলাম, সংসার তুমি একেবারেই চেন না ভায়া! ঐ কাগজওয়ালারাই ত দেশের সর্ব্বনাশ কর্‌লে, আমার ইচ্ছে হয় ওদের ধরে আচ্ছা করে চাব্‌কে দিই; ওদের কাজই হচ্ছে কেবল বড়লোকের খোসামোদ করা,—অমুক বড়লোক কবে একটু কেসেছিলেন, অমনিই তাই কাগজে সালঙ্কারে বেরিয়ে গেল। তিলকে তাল করে, সত্যকে মিথ্যে করে, দেশের সর্ব্বনাশ কর্‌তে কাগজওয়ালাদের মত আর দোসর নেই, তুমি যাও দিকি একটা ভাল কাজে,—তোমাকে আমলই দেবে না,—সম্পাদক-পুঙ্গব হয় ত তোমার দিকে মুখ তুলেই চাইবে না,—সতীশ ভায়ার এটা বেশ জানা আছে, কি বলহে সতীশ?"

সতীশ বলিল—"আমি সেদিন নাকে কাণে খত দিয়ে শপথ করেছি যে, কাগজওয়ালার আপিসে আর ঢুকছি না—ওরা সব দেশের কাজ করে না গুষ্টির পিণ্ডি দেয়। ওরা পুলিশকে গাল দেয়,কিন্তু ব্যবহারে ওরা পুলিসের চেয়ে কম নয়। খবর কাগজওয়ালাদের কম্পোজিটার, প্রিণ্টার হ'তে আরম্ভ ক'রে, মাছি টিকটিকি পর্য্যন্ত সব সমান। কি বল রাইদা ?"

রাইচরণ বলিল,—"ওদের কীর্ত্তির কথা আর কত বল্‌ব, দেখ না, এই পাঁচটা বড়লোক মিলে যেমন একটা যৌথ-কারবার খুল্‌বে বলে বিজ্ঞাপন দিল, অমনই কাগজওয়ালারা তাদের কত বাহবা দিতে লাগল; তারপর যখন বছর দু চারের মধ্যে কারবার ফাঁসিয়ে গৃহস্থের কষ্টে সঞ্চিত চাঁদা আত্মসাৎ করে, তাঁ'রা গা ঢাকা দিলেন, খবরের কাগজওয়ালা তখন একেবারে চুপচাপ, তাঁ'রা যে বড়লোক! এই সেদিন দেখলাম, বড় বড় হেডিং দিয়ে কাগজে ছাপা হয়েছে,—"বিনাপণে বিবাহ—আমাদের দেশবাসী সকলে সত্যবাবুর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করুন্; তিনি তাঁহার এম, এ পাশকরা পুত্রের বিবাহে এক পয়সাও দাবী করেন নাই। এই মানুষের কাজ! দেশবাসী মাভৈঃ মাভৈঃ, আর কন্যার বিবাহে ভয়ে পিলে শুখাইতে হইবে না। আশা করি, সত্যবাবুর মত আদর্শ আমরা ঘরে ঘরে দেখিতে পাইব।" অথচ আসল ব্যাপারটা কি জান, সত্যবাবু যেখানে তাঁ'র ছেলের বিয়ে দিয়েছেন, তাঁ'রা দশ হাজার টাকার গয়না দিয়েছেন, তা ছাড়া মেয়ের নামে পঞ্চাশ হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ আছে। অথচ এই হ'ল আমাদের দেশে বিনাপণে বিয়ে—খবর-কাগজওয়ালাদের দেশ উদ্ধারের পথনির্দ্দেশ—এই রকমের সব বিনা পয়সায় বিয়ের কথা আমাদের খবরের কাগজে বের হয়। যত সব খবরের কাগজ দেখছ, ওদের সব বড়লোক নিয়ে কারবার, গরীব, দুঃখীর কোনও খোঁজ ওরা রাখে না, আমলও দেয় না।"

কথায় কথায় তখন বেলা বাড়িয়া উঠিয়াছিল, প্রচণ্ড রৌদ্রের উত্তাপ এড়াইয়া গাছের ছায়ায় ছায়ায় যে যাহার গৃহে ফিরিল।

বছর খানেক পরে, বিশ্বেশ্বর বাজারের পথে রাইচরণকে বলিল,—“রাইদা এখন বুঝ্‌ছি তোমারই কথা ঠিক, কোন মতেই ত একটা পাত্র জোটাতে পাচ্ছি না। ঘটকদের সবাইয়ের এক কথা, কিছু পয়সা ছাড়ুন, না হ'লে পাত্র জোটাই কোত্থেকে, আগে টাকা, তারপর গানবাজনা লেখাপড়া—সত্যি রাইদা বড় ভাবিয়ে তুলেছে—সামান্য মাইনে পাই, কি করে টাকা জমাই বল দিকি—ঠিক করেছি বিঘা তিনেক জমিতে যা তিন চার শ টাকা পাওয়া যায়, তাই দিয়ে কোন রকমে মেয়েটাকে পার কর্‌ব, কিন্তু এখন দেখছি ও টাকায় কাণা খোঁড়া ছাড়া দু'খানি হাত-পা-ওয়ালা পাত্র মেলাই দায়, কি করি বলদিকি রাইদা? তোমরা পাঁচজনে একটু চেষ্টা না কর্‌লে ত আর মেয়েটার বিয়ে হয় না দেখছি। এত করে গান-বাজনা, লেখাপড়া, সেলাই, রান্না, ঘরসংসারের সমস্ত কাজ শেখালাম, তা একবার কেউ চেয়ে দেখলে না, সুধু টাকাটাই চিন্‌লে!”

বিশ্বেশ্বরের ব্যথিত কণ্ঠস্বরে রাইচরণ দুঃখিত হইয়া বলিল,—“সংসারের গতিকই এই, আচ্ছা দেখি চেষ্টা করে যদি কিছু করে উঠতে পারি।”

দুই বৎসর পূর্ব্বে বিশ্বেশ্বরের সহিত আজিকার বিশ্বেশ্বরের যেন কোন সাদৃশ্য নাই। একদিন এই বিশ্বেশ্বর যে হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইয়াছে তাহা আজ আর কেহ ধারণা করিতেও পারিবে না। তাহার সেই সদাপ্রফুল্ল মুখ-খানি দারুণ চিন্তার মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। এমনই গভীর সে মেঘ, একটু তৃপ্তির বিদ্যুৎস্ফুরণও তাহা ভেদ করিয়া বাহির হইতে পারে না। ভাবনার বিষম জ্বরে তাহার শরীর একেবারে ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে। কন্যা সুধাকে গানবাজনা, লেখাপড়া শিখাইবার সময় সে মনে মনে কত কল্পনাই করিয়াছিল,—সদ্বংশের একটী শিক্ষিত যুবক আদর করিয়া

তাহার সুধাকে বধূরূপে গৃহে তুলিয়া লইবে। সংসারানভিজ্ঞ বিশ্বেশ্বর তখন একবার ভাবিয়া দেখে নাই যে, এ সংসারে মানুষ শুধু টাকারই কাঙ্গাল, আর কিছুরই নহে; বন্ধু বল, আত্মীয়-স্বজন বল, সহোদর ভ্রাতা বল টাকা লইয়াই সম্বন্ধ। অর্থ ছড়াইতে পারিলে, এমন কি অর্থ বিস্তর আছে এই সংবাদ কোন রকমে প্রচার করিতে পারিলেও বন্ধুর অভাব হয় না, আত্মীয়স্বজনের অভাব হয় না! সংসারের এদিকটা বিশ্বেশ্বর কোন দিন চোক মেলিয়া দেখিত না বলিয়া হঠাৎ এই দৃশ্যে সে এতটা আঘাত পাইয়া একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

সেদিন রাত্রে বিশ্বেশ্বর ও তাহার পত্নীতে কথা হইতেছিল।

বিশ্বেশ্বর মুখখানি কালি করিয়া বলিল,—"তা রাইদা রাগ কর্‌লে কি কর্‌ব—আমি প্রাণধরে সুধাকে হরি ভট্টাচার্য্যের হাতে দিতে পার্‌ব না।"

মাধুরী কাঁদকাঁদ স্বরে বলিল,—"তা ছাড়া আর উপায় কি বল, আমাদের মত গরীবের মেয়ের ওর চেয়ে ভাল পাত্র জুট্‌বে কোত্থেকে।"

বিশ্বেশ্বর বলিল,—"তা বেশ বুঝেছি মাধুরী, কিন্তু ওর চেয়ে হাত পা বেঁধে সুধাকে ইচ্ছামতীর জলে ফেলে দিয়ে আসব, চোকের সামনে ত তা'র দুর্দ্দশা দেখ্‌তে হবে না।"

তারপর খানিকক্ষণ উভয়ে নীরবে বসিয়া রহিল।

মাধুরী ভগ্নকণ্ঠে বলিল,—"জাত ত কোনমতে রক্ষে কর্‌তে হবে।"

বিশ্বেশ্বর রুক্ষস্বরে বলিল,—"মেয়েটাকে ইছামতীর জলে ডুবিয়ে দিলেও জাত রক্ষে হ'বে না?"

মাধুরী সভয়ে স্বামীর আরও নিকট গিয়া গায়ে হাত দিয়া গাঢ়স্বরে বলিল,—"তুমি যদি অমন কর, আমি তা হ'লে কার ভরসায় সংসারের কাজকর্ম্ম কর্‌ব?"

, বিশ্বেশ্বর মাধুরীর কাঁধের উপর মাথা রাখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া হৃদয়ের গুরুভার অনেকটা লঘু হইয়া গেল। সে তখন ক্ষীণ-কণ্ঠে বলিল,—"মাধু, একটী পাত্র এখনও হাত ছাড়া হয় নি, আমাদের মত গরীবের পক্ষে সে সাত রাজার ধন মাণিক, পাত্রটিও দেখতে শুনতে ভাল, দুটো পাশ করেছে, মোটা ভাত মোটা কাপড়েরও সংস্থান আছে, এর চেয়ে ত আমরা আর কিছু চাইনি। তবে তিন শ টাকায় হবে না। মেয়ে তাদের খুব পছন্দ হয়েছে, তাই অপর জায়গায় ১৫০০৲ দেড় হাজার টাকা পাওনা ছেড়ে আমাদের এখানে হাজার টাকায় বিয়ে করতে রাজি হয়েছে। বাকি জমিটুকু বেচে আরও শ দুই টাকা জোগাড় হবে, বাকি পাঁচশ টাকার জন্যে দু তিন মাস সময় চেয়ে নিয়েছি, তাঁ'রা তাতে রাজি আছেন। আজ থেকে এক-বেলা করে খাওয়া যাক্—তাতে দু তিন মাসে কিছু জমবে, তারপর এই ভিটেটা আছে।"

মাধুরী একটু আশ্বস্ত হইয়া বলিল,—"তা যা হয় হ'বে, তুমি আজ ঘুমোও অনেক রাত হয়ে গেছে, কাল আবার সকালে উঠেই ত আপিসে দৌড়িতে হ'বে।"

মাসখানেক পরে বিশ্বেশ্বর বিবর্ণমুখে পত্নীকে বলিল,—"সর্ব্বনাশ হয়েছে, সে পাত্রটির অন্য এক জায়গায় বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে, তারা সতর শ টাকা দেবে, সে কে জান ত মাধুরী, রাইচরণদাদার ভাগ্নী; রাইচরণ দাদাই এ সম্বন্ধ ঠিক করে দিয়েছেন।" সে আর বেশী কিছু বলিতে পারিল না, সেইখানে অবসন্নদেহে বসিয়া পড়িল।

রাত্রে আহারের ঠাঁই করিয়া মাধুরী ডাকিতে আসিলে বিশ্বেশ্বর বলিল,—"আর ভাত গলা দিয়ে গলবে না, একটু বিষ এনে দাও, সব জ্বালা জুড়িয়ে ফেলি।"

মাধুরী, সুধা, হাসি তিন জনে মিলিয়া বিশ্বেশ্বরকে কত ডাকাডাক

করিল কিন্তু বিশ্বেশ্বর কিছুতেই উঠিল না। অনাহারে শয্যার উপর পড়িয়া রহিল।

পরদিন প্রত্যূষে মাধুরী ব্যগ্র হইয়া তাহার স্বামীকে বলিল,—"ওগো, সুধাকে দেখ্‌তে পাচ্ছিনা কেন, এত ভোরে সে কোথায় গেল বল দিকি? সে ত কখনও বাড়ী থেকে বেরোয় না, আমার বুকটা যে সত্যি কেমন কর্‌চে।"

বিশ্বেশ্বর হতবুদ্ধির মত বলিয়া উঠিল,—"অ্যাঁ, কি বল্‌লে, সুধা নেই!"

মাধুরী অতি ব্যস্ত হইয়া বলিল,—"উঠে একবার খুঁজে দেখ, সুধা আমার কোথায় গেল!"

এমন সময় বিশ্বেশ্বর শয্যার উপর একখানি পত্র কুড়াইয়া পাইল। অন্যমনস্কভাবে সেই পত্রখানি পড়িয়া ধড়মড় করিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া বলিল,—"সুধার জন্য ভাবছিলে, এই নাও তার চিঠি।"

মাধুরী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল,—"ওগো, সত্যি তা হলে সুধা আমাদের ছেড়ে চলে গেছে, ও চিঠি আমি দেখতে পারব না, তোমার পায়ে পড়ি, আমায় বল—সুধা কি আমার চলে গেল?"

বিশ্বেশ্বর উত্তরে সুধু বলিল,—"সে রক্ষে পেয়েছে, আমাদেরও জাত রক্ষে হয়েছে।"

"মা সুধা—ও মা সুধারে" বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া মাধুরী মেজের উপর লুটাইয়া পড়িল। তাহার কণ্ঠ হইতে আর কোন স্বর বাহির হইল না।

ইছামতী সুধাকে ক্রোড়ে স্থান দিবার দিন পনের পর বাড়ীর সম্মুখ দিয়া সুধার জন্য মনোনীত সেই পাত্রটি পাল্কি চড়িয়া বিবাহ করিতে গেল, বিশ্বেশ্বর রোয়াকের উপর বসিয়া স্তব্ধ হইয়া তাহা দেখিল। তাহার বুকটার মধ্যে শতবজ্র এক সঙ্গে আসিয়া বাজিল।

দেখিতে দেখিতে মাস দুই কাটিয়া গেল। বিশ্বেশ্বর আপিস যায় না, অধিকাংশ সময় চুপটি করিয়া রকের উপর বসিয়া থাকে। আপিসের সাহেব তাহাকে দয়া করিয়া অর্দ্ধ মাহিনায় তিন মাস ছুটি দিয়াছেন।

সে দিন সন্ধ্যার সময় মাধুরী আসিয়া কহিল, "হাসির জ্বরটা বড্ড বেড়েছে, তোমাকে ডাক্‌ছে।"

বিশ্বেশ্বর ভিতরে গিয়া দেখিল হাসি জ্বরের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। বিশ্বেশ্বর একবার মাত্র ফিরিয়া দেখিল। বছর দুই পূর্ব্বে হাসির সামান্য জ্বর হওয়ায় সে আপিসের পোষাকে ডাক্তারের বাড়ী ছুটিয়াছিল, আর আজ! সে হাসিতে হাসিতে কক্ষ ত্যাগ করিয়া গেল এবং বাহিরের রোয়োকে গিয়া চুপ্‌টি করিয়া বসিয়া রহিল। একবার হাসির গায়ে হাত দিয়া দেখিল না, একবার তাহার সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন অবধি করিল না। দিন চারেক পরে মাধুরী বলিল,—"হ্যাঁ গো খুকীর জ্বর যে একেবারে ছাড়ল না, একবার ডাক্তারবাবুকে ডেকে এনে যাহ'ক ওষুধ দাও।"

বিশ্বেশ্বর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল,—"পয়সা নেই, ডাক্তারটাক্তার দেখান হ'বে না, ইছামতীর জল খাওয়াও।"

মাধুরী কাতরকণ্ঠে বলিল,—"ও কি বলছ তুমি?"

বিশ্বেশ্বর কর্কশস্বরে বলিল,—"ঠিক বল্‌ছি, যাও।"

আরো দিন দুই কাটিয়া গেল, জ্বরটা একটু কম পড়িল বটে, কিন্তু একেবারে গেল না। হাসি উঠিয়া হাঁটিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিন্তু ঘুষঘুষে জ্বরে সে দিন দিন শুখাইয়া যাইতে লাগিল।

সেদিন সন্ধ্যার সময় বিশ্বেশ্বর খানিকটা তেঁতুল হাসির হাতে দিয়া বলিল,—"খা বেশ লাগবে এখন।"

হাসি পিতার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"আমার যে জ্বর বাবা, তেঁতুল খেলে আরও অসুখ কর্‌বে।"

বিশ্বেশ্বর ধমক দিয়া বলিল,—"ঐ টুকু মেয়ের আবার জ্যাঠামি, আমি বল্‌ছি তুই খা শীগ্‌গির খা।"

হাসি ভয়ে ভয়ে তেঁতুল মুখে পুরিয়া দিল। এমনই করিয়া বিশ্বেশ্বর প্রতিদিন ধমক দিয়া হাসিকে নানাপ্রকার কুপথ্য খাওয়াইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে হাসি শয্যাগ্রহণ করিল। মাধুরী আরও দুই তিন দিন ডাক্তারের কথা বলিয়াছিল, কিন্তু বিশ্বেশ্বরের নিকট তিরস্কার খাইয়া সে আর ডাক্তা-রের কথা মুখে আনে নাই। সে প্রতিদিন একটু করিয়া তুলসী পাতার জল হাসির মুখে দিত আর জোড়হাত করিয়া তেত্রিশ কোটি দেবতার নিকট প্রার্থনা করিত।

সে দিন হাসির রোগের যন্ত্রণা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বিশ্বেশ্বর গুম হইয়া রুগ্ন-শয্যা পার্শ্বে বসিয়াছিল। হাসির অসুখ শুনিয়া তাহার এক মামা তাহাকে দেখিতে আসিয়াছিল, সেও সেখানে উপস্থিত ছিল।

হাসি গড়াইতে গড়াইতে তাহার বাপের কোলের কাছে গিয়া ক্ষীণ-কণ্ঠে বলিল,—"বাবা আমায় একটু ওষুধ এনে দাও, ওষুধ খেলে আমি ঠিক বাঁচ্‌ব বাবা।"

বিশ্বেশ্বর মুখ ফিরাইয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

হাসি আবার বলিল,—"বাবা, বড্ড বুকজ্বালা কর্‌ছে, একটু ওষুধ এনে দাও বাবা।"

তাহার মাতুল নিকটে আসিয়া বলিল,—"ওর বুঝি ওষুধ ফুরিয়ে গেছে?"

হাসি তেমনই ক্ষীণকণ্ঠে বলিল,—"মামাবাবু, বাবা ত এবার আমায় একটুকুও ওষুধ খেতে দেয়নি।" তারপর বিশ্বেশ্বরের গায়ে হাত দিয়া বলিল,—"ওষুধ খেলে আমি বাঁচ্‌ব, তুমি আমায় একটু ওষুধ এনে দাও বাবা।"

বিশ্বেশ্বর সজোরে কন্যার হাতখানি ঠেলিয়া দিয়া বিকৃতমুখে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

হাসির মাতুল মাধুরীর নিকট সমস্ত কথা শুনিয়া তখনই ডাক্তার আনিতে বাটীর বাহির হইয়া গেল।

বিশ্বেশ্বর উঠিয়া ঘরের মধ্যে পদচারণা করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

মাধুরী স্বামীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কহিল, "তুমি একবার হাসিকে কোলে নাও, সে আপনি সেরে যাবে।"

বিশ্বেশ্বর ধমকাইয়া উঠিয়া কহিল, "চুপ !"

তখন ডাক্তারবাবুকে সঙ্গে করিয়া এক শিশি ঔষধ হাতে লইয়া হাসির মাতুল গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল।

দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বিশ্বেশ্বর বলিল,—"খবরদার, ঘরের মধ্যে ঢুক্‌বে ত খুন কর্‌ব।"

উভয়ে গভীর বিস্ময়ে তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল।

বিশ্বেশ্বর ক্ষিপ্রহস্তে হাসির মাতুলের হাত হইতে ঔষধের শিশিটি কাড়িয়া লইয়া দূরে ছুড়িয়া ফেলিল।

———

ঘটকালী।

(১)

সেই গ্রামে ইন্দিরার মত সুন্দরী মেয়ে আর একটিও ছিল না। শুধু সেই গ্রামেই কেন, এমন সুন্দরী মেয়ে কচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন রঙ্, তেমনই গড়নপেটন, কোথাও এতটুকু খুঁৎ ছিল না। মাথায় ঈষৎ-কুঞ্চিত একরাশ কাল চুল, আয়ত চক্ষু, তাহার উপর টানা-টানা ভ্রূযুগল, যেন কোন্ নিপুণ চিত্রকর তুলি দিয়া ভ্রূযুগল আঁকিয়া দিয়াছে। উন্নত নাসিকা, পাতলা ঠোঁট দু'খানি, মুখখানির সৌন্দর্য্য পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। তাহার সমবয়সী এবং তাহার অপেক্ষা বয়সে ছোট অনেকগুলি কুরূপা মেয়েরও পয়সার জোরে বিবাহ হইয়া গেল, কিন্তু ইন্দিরার বিবাহ হইল না। সে যে দরিদ্র বিধবার মেয়ে! অর্থ ছিল না, চেষ্টা করিয়া পাত্রের সন্ধান করিয়া দেয় এমন কোন আত্মীয়ও ছিল না।

একখানি জীর্ণ কুটীরে মা ও মেয়ে বাস করিতেন। সামান্য কিছু জমি ছিল; তাহা ভাগে জমা দিয়া কোন ক্রমে কায়ক্লেশে তাঁহাদের দিনাতিপাত হইত। গ্রামে বর্দ্ধিষ্ঠ ধনবান লোকের অভাব ছিল না, কিন্তু তাঁহারা দুঃখীর

সংবাদ রাখিতেন না। কে-ই বা রাখিয়া থাকে? প্রাসাদতুল্য অট্টালিকার দশ হাত দূরে দুঃখীরা হয় ত কোনদিন এক বেলা খাইতেছে, কোন দিন বা নিরন্নে কাটাইতেছে, সে সংবাদ কোন্ বড়লোক রাখিয়া থাকেন? একথা যদি তাঁহাদের কাছে কেহ কোন দিন উল্লেখ করে, তাঁহারা নিছক গল্প ভাবিয়া, তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দেন; মানুষ নাকি আবার নিরন্নে দিন কাটায়! তাঁহারা হয় ত মনে মনে ভাবেন ও আর কিছু নয়, কিছু আদায়ের চেষ্টা!

পীতাম্বর দরিদ্র ব্রাহ্মণকুমার। বয়স অনুমান চৌদ্দ পনর বৎসর। পৈতৃক আমলের দুই চারি ঘর যজমান ছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ বা শ্রদ্ধা করিয়া, কেহ বা অশ্রদ্ধা করিয়া, আবার কেহ বা কোন কিছু না ভাবিয়া অর্থাৎ অন্যান্য খরচের মধ্যে ইহাও একটা খরচ স্থির করিয়া, যাহা হাতে তুলিয়া দিতেন, তাহাতে পীতাম্বরের স্কুলের মাহিনা ও অন্নবস্ত্রের কোন রকমে সঙ্কুলান হইত। এই পীতাম্বর ছিল, ইন্দিরাদের একমাত্র ভরসা। পীতাম্বর প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় আসিয়া তাহাদের সংবাদ লইয়া যাইত, যে দিন চালের অভাবে হাঁড়ি চড়িত না, সে দিন যে প্রকারে হউক, সে তাহাদের আহার্য্যের ব্যবস্থা করিয়া দিত। এমন দুই এক দিন গিয়াছে, যে দিন পীতাম্বর আধ পয়সার মুড়ি খাইয়া রাত্রি কাটাইয়া দিয়াছে, তাহার নিজের জন্য যে যৎসামান্য চাল ছিল, তাহা দিয়া ইন্দিরা ও তাহার জননীর ক্ষুন্নিবারণ করিয়াছে। ইন্দিরা তাহাকে অম্বর দাদা বলিয়া ডাকিত। ইন্দিরার জননী এই মাতৃহীন ব্রাহ্মণকুমারকে আপন সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিতেন।

দুঃখীর মেয়ে ইন্দিরা পেট ভরিয়া খাইতে না পাইলেও, তাহার সমবয়সী ধনী কন্যাদের মতই সে বাড়িতে লাগিল। তাহার চেহারা দেখিলে কে বলিবে যে, সে পেট পূরিয়া খাইতে পায় না। হায়রে সংসার! পাড়াপড়শীরা

ইহাদেরও হিংসা করিত। ইন্দিরার জননীকে শুনাইয়া পড়শীরা বলিত, গরীবের মেয়ের আবার অত রূপ কেন, অত চুলের বাহার কেন? ইন্দিরার জননী চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে নীরবে তাহাদের সম্মুখ হইতে চলিয়া আসিতেন। একদিন ইন্দিরার সম্মুখে কে দুইজন পড়শী সমস্বরে তাহার জননীকে ঐ কথা বলিয়া উপহাস করিল। ইন্দিরা সহ্য করিতে না পারিয়া কহিল, "ভগবানের বোঝবার ভুল! তোমরা গিয়ে তাঁকে বুদ্ধি দিয়ে এলেই পারতে!" তাহারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, "দু'বেলা খেতে পায় না, এদিকে রূপের গরবে ফেটে পড়ছেন। মনে ঠাউরে রেখেছিস্ ঐ রূপ বেচে খাবি—বেশ লো বেশ,—তাই খাস্ —তা অত দেমাক কেন!" বলিয়া প্রতিবেশিনীদ্বয় হন্‌হন্ করিয়া তাহাদের সম্মুখ হইতে চলিয়া গেল।

সেদিন সন্ধ্যার সময় ইন্দিরার জননী পীতাম্বরকে কহিলেন, "বাবা, আর কতদিন সে ছেলের আশায় বসে থাকবি। সে দুটো পাশ করেছে তিনটের পড়া পড়ছে. সে কেন গরীবের মেয়ে বিয়ে করতে যাবে! দোজপক্ষ, তেজপক্ষ, যা হ'ক একটা পাত্র ঠিক করে দে বাবা! আমার জাতটা রক্ষে হ'ক! বাবা, দুবেলা মেয়েটাকে খেতে দিতে পারি না, তার ওপর এ যন্ত্রণা আর সইতে পাচ্ছি না।"

পীতাম্বর খানিকক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "তাই হবে মা,—শৈলেনকে প্রায় নিমরাজি করে এনেছিলাম, আর কিছুদিন অপেক্ষা করতে পারলে বোধ হয় তাকে রাজি করতে পারতাম। সে বলে, 'মার আর কাকার মত না হ'লে আমি আর বিয়ে করতে পারব না', তার মার মনটা নরম করতে পারলে কোন ভাবনা থাকবে না, সেই চেষ্টাই করছিলাম!"

ইন্দিরার জননী চোখ মুছিতে লাগিলেন।

(২)

পীতাম্বর বিবাহের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছে। সে যে শৈলেনের আশায় নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়াছিল তাহা নহে, কিন্তু কোথাও কিছু সুবিধা করিতে পারে নাই। পরদিন সকাল বেলা কাগজে বিজ্ঞাপন পড়িয়া ভিক্ষার দ্বারা রেলভাড়া সংগ্রহ করিয়া কলিকাতায় এক বিবাহ-সমিতিতে গিয়া উপস্থিত হইল। সে প্রায়ই কাগজে পড়িত, অমুক নামজাদা সম্পাদক, অমুক নামজাদা জমিদার, অমুক নামজাদা স্বদেশীয় পাণ্ডা, সমিতির সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া পণপ্রথার বিরুদ্ধে মস্ত বক্তৃতা করিয়াছেন, তাঁহাদের বক্তৃতায় প্রকাণ্ড হলঘর প্রকম্পিত হইয়াছে, উৎসাহী যুবকদলের ঘন ঘন করতালি-ধ্বনিতে সভাগৃহ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে, সমিতির সম্পাদক বিজয়গর্ব্বে দুই হাত তুলিয়া নৃত্য করিয়াছে! পড়িতে পড়িতে সুদূর-পল্লীবাসী পীতাম্বরের মনে হইত, এই সমিতিই দেশের প্রকৃত মঙ্গল-কার্য্যে ব্রতী হইয়াছে—ইহার সম্পাদক নিশ্চয়ই একজন মহাপুরুষ, প্রকৃত কর্ম্মী! কলিকাতার পথে তাহার মনে হইয়াছিল, সে কি মূর্খ, এমন মহাপুরুষেরও সে এত দিন শরণাপন্ন হয় নাই! যথাসময়ে সমিতিতে উপস্থিত হইয়া সে কম্পিতহৃদয়ে সম্পাদকের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। সম্পাদক মহাশয় কি লিখিতেছিলেন, পীতাম্বরের পদশব্দ তাঁহার সতর্ক কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিবামাত্র তিনি মুখ তুলিয়া গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "আমার সঙ্গে আপনার দরকার আছে?"

পীতাম্বর অত্যন্ত বিনয়ের সহিত কহিল, "আজ্ঞে হাঁ, খবরের কাগজে আপনার ধন্য ধন্য শুনে, বহুদূর থেকে আমি আপনাকে দর্শন করতে এসেছি।"

সম্পাদক মহাশয়ের অন্তর আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। মাছ টোপ গিলিয়াছে, আর ভাবনা কি, এইবার টানিয়া তুলিব! তিনি সাহস্যবদনে কহিলেন, "টাকা এনেছেন?"

পীতাম্বর বিস্ফারিত নয়নে কহিল, "টাকা! কিসের টাকা?"

সম্পাদক মহাশয় দমিয়া গেলেন। তাহা হইলে টোপ গেলে নাই! শুধু চারের গন্ধে ছুটিয়া আসিয়াছে। দেখা যাক্, যদি কোন রকমে টোপ গিলাইতে পারি? তিনি প্রকাশ্যে কহিলেন; "আপনি পাত্রের সন্ধানে এসেছেন ত?"

পীতাম্বর কহিল, "আজ্ঞে।"

সম্পাদক মহাশয় কহিলেন, "দুই টাকা দিয়ে আমাদের সমিতির সভ্য না হ'লে ত আমরা সমিতির নিয়ম অনুযায়ী আপনাকে কোন সংবাদ দিতে পারি না।"

পীতাম্বর আশান্বিত হইয়া কহিল, "আজ্ঞে, তা যেমন করে হ'ক দুটাকা যোগাড় করে দেব।"

তাহা হইলে টোপ গিলিবে! সম্পাদক মহাশয় তাহাকে খাতির করিয়া বসাইয়া কহিলেন, "পাত্রীটি ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, না আর কোন জাত?"

পীতাম্বর কহিল, "আজ্ঞে কায়স্থ।"

সম্পাদক মহাশয় কহিলেন, "বেশ। দেখতে শুনতে কেমন, গৌরবর্ণ না শ্যামবর্ণ?"

পীতাম্বর কহিল, "গৌরবর্ণ, অমন সুন্দরী মেয়ে কচিৎ দেখতে পাওয়া যায়।"

সম্পাদক মহাশয় হাসিয়া কহিলেন, "পাত্রী-পক্ষেরা প্রায়ই ঐ এক রকমেরই কথা বলে থাকেন, যাক্, এখন কি রকম খরচপত্তর করতে পারবেন?"

পীতাম্বর চমকিয়া কহিল, "তারা :যে বড় গরীব, দুবেলা খাওয়া জোটে না , খরচ ত কিছু কর্‌তে পারবে না, তাই আপনার শরণাপন্ন হয়েছি।"

সম্পাদক মহাশয় হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিলেন, "আচ্ছা টাকা জমা দিন তারপর সন্ধান করে দেখা যাবে।"

পীতাম্বরের কাছে মাত্র দুইটি টাকা ছিল, ফিরিবার গাড়ী ভাড়া টাকা দেড়েক ও দুই বেলার হোটেলের খরচ। ভবিষ্যতের কথা চিন্তা না করিয়াই সেই দুই টাকা পীতাম্বর সম্পাদক মহাশয়ের হাতে তুলিয়া দিল।

সম্পাদক মহাশয় মহানন্দে তাহার নাম ও ঠিকানা খাতায় লিখিয়া লইয়া কহিলেন, "তা হ'লে আপনি এখন যেতে পারেন, বিনে পয়সায় যদি কেউ বিয়ে করতে চায় আমি আপনাকে ডাকে সংবাদ দেব। তার আশা খুবই কম। এখনকার দিনে কেন লোকে বিনে পয়সায় বিয়ে করতে চাইবে! এই বি, এ, এম, এ পাশ করা, এও ত টাকার জন্যে—তাতে কত পরিশ্রম করতে হয়, কত খরচ করতে হয়, আর বিনে পরিশ্রমে, বিনে খরচে যদি বিয়ে করে কিঞ্চিৎ পাওয়া যায় তা মন্দ কি! আমি নিজে ত কাউকে বিনে পয়সায় বিয়ে কর্‌তে বলতে পারি না। তবে যদি এখনকার ছেলেদের মধ্যে দুই একজন এমন মাথাপাগলা থাকে তা হ'লে হয় ত বিনে পয়সায় বিয়ে হতে পারে। আমি আজ ক'বছর এই কাজ করছি, তা বরাবরই দেখে আসছি বিয়ের বেলায় ছেলেরা অতিমাত্রায় চালাক হয়, অন্য সব বিষয়ে পাগলামি করে, কিন্তু বিয়ের সময় পাওনা আদায়ের বেলা তাদের জ্ঞান টন্‌টনে।"

পীতাম্বর স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। এই কি সেই সমিতি, না সে ভুল করিয়া অন্য কোন:সমিতিতে আসিয়াছে।

তাহার মনোগত ভাব অনুমান করিয়া সম্পাদক মহাশয় হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "এ রকম ভুল যে শুধু আপনার হয়েছে তা নয়, এমন ভুল অনেকেরই হ'য়ে থাকে। ও রকম বড় বড় সভা করে নামজাদা লোকদের সভাপতির আসনে বসিয়ে হৈ চৈ করতে না পারলে, আমার এই সমিতি প্রচার হবে কি করে।"

পীতাম্বর হতাশভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া নীরবে সে স্থান ত্যাগ করিল। পীতাম্বরের মনে হইল, "এ সংসার কেবল ছলনায় পূর্ণ, এখানে পরকে ত লোক প্রাতরণা করেই—তা ছাড়া নিজেকেই নিজে প্রতারণা করে। এই সব ছেলের দল বিবাহের পণ লওয়ার বিরুদ্ধে কত সভা—সমিতি করিয়া বেড়ায়, কিন্তু তাহাদের নিজেদের বিবাহের বেলা, কেহ বলে, এখনও সে বিবাহ-বয়স প্রাপ্ত হয় নাই—কেহ বলে, উপার্জ্জনক্ষম না হইয়া বিবাহ করিব না; এবং অনেকেই হঠাৎ অতিমাত্রায় পিতৃ-মাতৃভক্ত হইয়া উঠে!" সে ভাবিতে ভাবিতে গৃহে ফিরিল। আর ইন্দিরাকে অবিবাহিতা রাখা চলে না! কপর্দ্দকহীন অবস্থায় কলিকাতার পথে পথে ঘুরিয়া কি ভাবে রেল-ভাড়া সংগ্রহ করিয়া সে যে বাড়ী ফিরিয়াছিল, তাহা অন্তর্য্যামীই বলিতে পারেন।

(৩)

গ্রামে ফিরিয়া শুনিল ইন্দিরার বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে। এক পলিত-কেশ গলিতদন্ত বৃদ্ধ কি এক কার্য্যোপলক্ষে গ্রামে বেড়াইতে আসিয়া ইন্দিরাকে দেখিতে পান। মাস দুই পূর্ব্বে বৃদ্ধের স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছিল। ইন্দিরার রূপে মুগ্ধ হইয়া বৃদ্ধ তাহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিয়া

বলিয়া পাঠান, বিবাহের যাহা কিছু খরচ সে সমস্তই তিনি বহন করিবেন, মেয়েটীকে সোনায় মুড়িয়া গৃহে লইয়া যাইবেন। ইন্দিরার জননী তৎ-ক্ষণাৎ স্বীকৃতা হইলেন। বৃদ্ধও ইন্দিরাকে সেই দিনই আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং জ্যৈষ্ঠের শেষ তারিখে বিবাহ স্থির হইয়া গেল।

নিরুপায় পীতাম্বর কোন আপত্তি করিল না। ইন্দিরার জন্য তাহার অন্তর হাহাকার করিয়া উঠিল। সে মনে মনে স্থির করিল, আর একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবে।

দেখিতে দেখিতে বিবাহের দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। বৃদ্ধ বর ষোল-বেহারার পাল্কী চড়িয়া সঙ্গে জন পনের কুড়ি বরযাত্রী লইয়া গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন গ্রীষ্মের ছুটি উপলক্ষে স্কুল বন্ধ ছিল। বৃদ্ধ বরযাত্রীসহ স্কুলগৃহে আড্ডা লইলেন। তখন বেলা আটটা, রাত্রি সাড়ে সাতটার সময় বিবাহের লগ্ন।

বেলা প্রায় দশটার সময় প্রায় কুড়িজন ছাত্র চাঁদার খাতা লইয়া বৃদ্ধ বরের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, "মশায় আমাদের স্কুলের ক্লাবের জন্য আপনাকে ৫০৲ টাকা চাঁদা দিতে হবে।" সে দলে পীতাম্বরও ছিল। বৃদ্ধ একগাল হাসিয়া কহিলেন, "তা দোব বৈকি, বেলা একটার সময় তোমরা আমার সঙ্গে দেখা কর।" "যে আজ্ঞে" বলিয়া ছাত্রের দল চলিয়া গেল, কেবল পীতাম্বর বৃদ্ধের সহিত বসিয়া গল্প করিতে লাগিল, আধঘণ্টা পরে সেও চলিয়া গেল।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে অর্থাৎ বেলা একটার সময় ছাত্রের দল আবার চাঁদার খাতা লইয়া উপস্থিত হইল। বৃদ্ধ তাহাদের দেখিয়াই রুক্ষ স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ওসব চালাকি আমার সঙ্গে চল্‌বে না। যা যা এখান থেকে যত সব বকাটে ছেলে, লেখা নেই, পড়া নেই, এসেছে চাঁদার খাতা নিয়ে, তোদের সব বিদ্যের কথা আমি শুনেছি!"

অপমানিত ছাত্রের দল হৈ হৈ করিতে করিতে মাঠে আসিয়া জমা হইল। কি করিয়া যে পাঁচ মিনিটের ভিতর গ্রামময় সমস্ত ছাত্রের মধ্যে এই অপমানের সংবাদ রাষ্ট হইল,তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না। দেখিতে দেখিতে চারি পাঁচ শত ছাত্র আসিয়া সেই মাঠে সমবেত হইল। পীতাম্বর তাহাদের উত্তেজিত করিতে লাগিল, এবং ক্রমে ক্রমে তাহাদের দলপতির আসন গ্রহণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল, "গ্রামে এসে আমাদের অপমান করে যাবে, এ কিছুতেই সহ্য হবে না।" তাহার কথা শেষ হইবর পূর্ব্বেই আর দুই তিন জন ছাত্র সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "কিছুতেই না, কিছুতেই না, এ অপমান সহ্য করা হবে না। বুড়ো বেটাকে এখনই তাড়াও।"

পীতাম্বর বহুকষ্টে তাহাদের কথঞ্চিৎ শান্ত করিয়া কহিল, "তাড়ান ত আর কিছু শক্ত কাজ নয়, ও বুড়োটাকে তাড়াতেই হবে। কিন্তু যাঁর মেয়ে তার অবস্থা কি হবে?"

একজন বলিয়া উঠিল, "আজই অন্য পাত্র ঠিক করে মেয়েটীর বিয়ে দাও! যেমন করে হ'ক বুড়োটাকে তাড়াতেই হবে।"

তখন চারিদিকে,"পাত্র ঠিক কর, পাত্র ঠিক কর," রব পড়িয়া গেল।

পীতাম্বর কহিল, "দেখ, শৈলেনের বিয়ের কথা হচ্ছে, তাকে গিয়ে সবাই ধর।" ছাত্রের দল উৎসাহভরে শৈলেনের সন্ধান লইতে ছুটিল, কিন্তু বেশীদূর যাইতে হইল না। শৈলেনও তাহাদের দলের মধ্যে ছিল। "এই যে শৈলেন,—এই যে শৈলেন" বলিতে বলিতে সকলে তাহাকে ঘেরিয়া ফেলিল। "বিয়ে করতেই হবে।"

শৈলেন কহিল, "মার মত হলে আমার কোন আপত্তি নেই।"

পীতাম্বর কহিল, "শৈলেন ঠিক বলেছে, মার মত করাতেই হবে।"

তখন ছাত্রের দল শৈলেনের বাড়ীর অভিমুখে ধাবিত হইল।

একটা "হৈ হৈ" শব্দ শুনিয়া শৈলেনের জননী গৃহের বাহিরে আসিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন। চারিজন ছাত্র অগ্রসর হইয়া যোড়হাত করিয়া সমস্ত নিবেদন করিল।

জননী কহিলেন, "তা কখনও হয়, সে আমি কিছুতেই পারব না। তোমরা ত জান, শৈলর কাকার মত ছাড়া আমি কোন কাজ করতে পারি না।"

ছাত্রেরা অনেক করিয়া তাঁহার নিকটে কাকুতি-মিনতি করিল, কিন্তু তিনি কিছুতেই রাজি হইলেন না।

পীতাম্বর ছয় সাত জন ব্রাহ্মণযুবককে একটু দূরে ডাকিয়া লইয়া কি পরামর্শ করিল। তার পর পীতাম্বর ও সেই ছয় জন ব্রাহ্মণকুমার তাঁহাদের যজ্ঞোপবীত বাহির করিয়া দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া শৈলেনের জননীকে কহিলেন, "যদি আজ রাত্রেই শৈলেনের সঙ্গে সেই মেয়েটির বিয়ে না দেন, আমরা সাতজন ব্রাহ্মণের ছেলে আপনার ভিটেয় দাঁড়িয়ে পৈতে ছিঁড়ে ফেল্‌ব, এখানে অনাহারে প্রাণত্যাগ কর্‌ব।"

এই বলিয়া সত্য সত্যই সেই সাতজন ব্রাহ্মণকুমার পৈতা ছিঁড়িতে উদ্যত হইল। হিন্দু-বিধবার মন আশঙ্কায় ভরিয়া উঠিল। কি সর্ব্ব-নাশ! তিনি ভীতিবিহ্বলস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "বাবা, দোহাই তোমা-দের, অমন কাজ ক'র না।"

কিন্তু তাঁহার কাকুতিমিনতি কিছুতেই যখন কিছু হইল না, তখন বিধবা গৃহের কল্যাণের জন্য পুত্রের বিবাহে সম্মতি দিতে বাধ্য হইলেন।

জয়ধ্বনিতে গৃহ-প্রাঙ্গণ মুখরিত হইয়া উঠিল।

বিধবা কহিলেন, "বাবা, কিন্তু আমার হাতে কিছু নেই—কি ক'রে খরচ চালাব?"

পীতাম্বর বলিয়া উঠিল, "তার জন্য ভাবনা কি মা, সে ভার আমাদের।"

আবার ছাত্রদের এক সভা বসিল। তখনই স্থির হইয়া গেল, প্রত্যেককে এক টাকা করিয়া চাঁদা দিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে চাঁদা তুলিবার ধূম পড়িয়া গেল। বালকেরা দলে দলে গ্রামের মধ্যে ছুটিল। ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যে প্রায় সাড়ে চারিশত টাকা সংগ্রহ হইয়া গেল। তখন বেলা পাঁচটা।

শৈলেনের বাড়ী বিবাহের আয়োজন চলিতে লাগিল, এ দিকে ছাত্রের দল লাঠিসোঁটা লইয়া স্কুলগৃহে গিয়া উপস্থিত হইল।

দুই তিন জন ছাত্র বৃদ্ধ বরের সম্মুখে গিয়া কহিল, "মশায়, ভালোয় ভালোয় এখান থেকে এখনই স'রে পড়ুন দেখি।"

বৃদ্ধ বিস্ফারিতনয়নে তাহাদের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "কি রকম?"

একজন বালক কহিল, "রকমটকম কিছু না, পাত্তাড়ি গুটিয়ে স'রে পড়ুন।"

বৃদ্ধ কুপিত হইয়া কহিলেন, "যা যা এখান থেকে, যত সব বাপ-মা-খেদান ছেলে। আমি তোদের ইয়ার কি না, আমার সঙ্গে এসেছে মস্‌করা কর্‌তে!"

বালকের দল ক্ষেপিয়া উঠিয়া কহিল, "ফের যদি গাল দেও,মার খাবে। এখনই বেরোও বল্‌ছি, না হ'লে শেষ মার খেয়ে বেরুতে হবে। তিনকাল গিয়ে এককাল ঠেকেছে, এসেছে আবার বিয়ে কর্‌তে!"

বৃদ্ধ সত্যই ভীত হইয়া উঠিলেন। তিনি ভিন্ন গ্রামের লোক, এতগুলি ছেলের সঙ্গে কি করিয়া অাঁটিয়া উঠিবেন,তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। অল্প কিছুক্ষণ পরে নরম হইয়া কহিলেন, "কত টাকা চাঁদা চাও বল, আমি এখনই দিচ্ছি। আর তোমাদের কিছু বল্‌ব না।"

পীতাম্বর হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "সে গুড়ে বালি। অমন সুন্দরী মেয়ে আপনার বরাতে নেই। চাঁদা—টাঁদায় আর এখন চলছে না।

লোকজন নিয়ে স'রে পড়ুন, না হ'লে পাল্কীখানাকে চূরমার ক'রে লাঠির চোটে আপনাকে গ্রাম ছাড়া কর্‌ব।"

বৃদ্ধ পীতাম্বরের দিকে চাহিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিল, "তুমিই তো ছোকরা যত গোল বাধালে। তুমি না বারণ করলে—" তাহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই পীতাম্বর ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া গেল।

বৃদ্ধ তখন, কখনও রাগ-প্রদর্শন, কখনও ব্যাকুল মিনতি করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না। শেষে যখন সত্যই লাঠি পড়িবার উদ্যোগ হইল, বৃদ্ধ শুষ্কমুখে পাল্কী চড়িয়া লোকজনসহ গ্রাম ত্যাগ করিলেন।

* * * *

রাত্রি প্রায় এগারটার সময় পাড়ার মেয়েরা যখন বর-কনে লইয়া বাসর জমকাইয়া বসিল, পীতাম্বর বাহিরে দাঁড়াইয়া অনন্ত নীলাকাশের দিকে চাহিয়া যোড়হস্তে বার বার ভগবান্‌কে প্রণাম করিতে লাগিল। দরদরধারে তাহার চক্ষু দিয়া জল ঝরিয়া পড়িল। এক অন্তর্য্যামী ব্যতীত তাহার এ ঘটকালীর কথা অপর কেহই জানিল না।

সুপ্তোত্থিত

(১)

কলিকাতার একটি ছোট গলির মধ্যে তাহাদের বাড়ী। বাড়ীটি অনুপমের পৈতৃক আমলের। তিন পুরুষের অত বড় অট্টালিকার মধ্যে মাত্র তিনটি ঘর তাহাদের নিজেদের বলিবার ছিল এবং সেই তিনটি ঘরের সংলগ্ন আট হাত প্রস্থ এবং বার হাত দীর্ঘ জমিটুকুও তাহাদের অংশে পড়িয়াছিল, তাহাতেই খোলার ঘর বাঁধিয়া রাঁধিবার জন্য একটু স্থান করিয়া লওয়া হইয়াছিল। যাহা কিছু করিবার, সমস্তই অনুপমের পিতাই করিয়া গিয়াছিলেন, পিতার অবর্ত্তমানে অনুপম তাহাদের বংশ-গৌরবের শেষ চিহ্নটুকু আজ পাঁচ বৎসর কোন রকমে বজায় রাখিয়া আসিয়াছে।

অন্যান্য সরিকেরা যে যাহার অংশ বিক্রয় করিয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে। ক্রেতা একজন বড় জমিদার। আর একজনের কত সাধের গড়া সেই সুদৃশ্য বাড়ীটাকে সমূলে উপড়াইয়া ফেলিয়া স্থানটিকে প্রমোদো-দ্যানে পরিণত করিয়াছে।

ছয় বৎসর হইল, অনুপমের বিবাহ হইয়াছে। তাহার স্ত্রী নির্ম্মলা বেশ সুশ্রী ও শান্ত। নির্ম্মলার পিতা একজন পল্লীবাসী গৃহস্থ ছিলেন, সংসার তাঁহার এক রকম স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইত। স্ত্রী এবং কন্যাটি লইয়াই তাঁহার সংসার। উদ্বৃত্ত ধান বিক্রয় করিয়া বৎসরের শেষে তিনি কিছু সঞ্চয় করিতে পারিতেন, তাহাতেই কন্যার বিবাহের সময় পাঁচ ছয়খানি গহনা এবং শ'পাঁচেক টাকা নগদ দিতে পারিয়াছিলেন।

বিবাহের পর তিন বৎসর নির্ম্মলার বেশ সুখেই কাটিয়াছে। শ্বশুরের আদর, স্বামীর বুক-ভরা ভালবাসা এবং পিতামাতার অগাধ স্নেহ তাহার মুখরা শাশুড়ীর কটু কথাকে চাপা দিয়া রাখিয়াছিল।

সহসা এক রাত্রির মধ্যে প্রচণ্ডা পদ্মা যেমন একটি সমৃদ্ধ গ্রামকে সমগ্র গ্রাস করিয়া ফেলে, ঠিক তেমনি করিয়া অবুঝ অদৃষ্ট নির্ম্মলার সমস্ত সুখ ও শান্তিকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। এক মাসের মধ্যে নির্ম্মলা পিতামাতা এবং শ্বশুর তিন জনকেই হারাইয়া বসিল। নির্ম্মলার স্বামীর সেই ভালবাসা পূর্ব্ব হইতেই অল্পে অল্পে শিথিল হইয়া আসিতেছিল। তাহাদের প্রতিবাসী সেই জমিদারের কোন এক দূরসম্পর্কীয় পোষ্য আত্মীয়ের সংসর্গে পড়িয়া অনুপম গোপনে মদ্য পান করিতে সুরু করিয়াছিল এবং মদের আনুষঙ্গিক প্রধান দোষটি অনুপমের উপর ধীরে ধীরে আপন অধিকার বিস্তার করিয়াছিল।

পিতার মৃত্যুর পর অনুপমকে আর গোপনে এবং সন্তর্পণে চলিতে ফিরিতে হইল না। সে এখন বাটীর মালিক। প্রকাশ্যে সে সব কাজ করিতে লাগিল, শ্লথচরণে টলিতে টলিতে সে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিত, অভাগিনী নির্ম্মলাকে যথেচ্ছা তাড়না করিত, এবং যখন তখন যা মুখে আসিত তাই বলিয়া গালি দিত। শুধু জননীর নিকট অনুপম বড় ঘেঁসিত না, কারণ, তাহার মাতার মুখের সঙ্গে সে আঁটিয়া উঠিতে পারিত না,

পরাজয় স্বীকার করিয়া তাহাকে পলাইতে হইত এবং সেই পরাজয়ের সমস্ত গ্লানি এবং আক্রোশ বেচারী নির্ম্মলাকে নীরবে সহ্য করিতে হইত।

(২)

এই সংসার সমুদ্রের উন্মত্ত তরঙ্গগুলির আঘাতে উৎক্ষিপ্ত হইয়াও নির্ম্মলা তাহার তিন বৎসরের একটি সদাহাস্যময়ী কন্যার শুভ্র দেহকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া কূলে পৌছিবার আশায় বুক বাঁধিয়া দিন অতিবাহিত করিতেছিল। তাহার সেই বুকের ধন খুকুমণি যখন আধ-আধ ভাষায়, 'মা' 'মা' বলিয়া ডাকিয়া তাহার বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িত,—বুকের সঙ্গে চাপিয়া ধরিয়া নির্ম্মলা তখন সমস্ত যন্ত্রণার, সমস্ত দুঃখের কথা ভুলিয়া যাইত। শিশুর সেই প্রাণমাতান আহ্বান এবং সেই সব-ভুলান স্পর্শের কি মোহিনী শক্তি!

নির্ম্মলার শ্বশ্রূমাতা ও সদামত্ত অনুপমও খুকীকে না ভালবাসিয়া থাকিতে পারিত না। এই খুকীই অনেক সময় নির্ম্মলাকে প্রহারের হাত হইতে রক্ষা করিত। অনুপম যখন টাকার জন্য নির্ম্মলাকে প্রথমে গালাগালি, পরে পীড়ন এবং অবশেষে প্রহার করিতে উদ্যত হইত, ক্রীড়ারত খুকী তখন তাহার খেলার সামগ্রী ফেলিয়া রাখিয়া, হাসিতে হাসিতে আসিয়া মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিত, "বাবা মা, বাবা মা।" অনুপমের উদ্যত হস্ত শিথিল হইয়া পড়িত, সেদিন আর তাহার প্রহার করা হইত না।

অনুপমের মাতা আবার যখন নির্ম্মলার বাপের বাড়ীর উল্লেখ করিয়া গালিবর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া খুকী অমনি তাহার ঠাকুরমার মুখের উপর তাহার কচি হাতটি চাপিয়া ধরিয়া ডাকিত, "ঠামা, ও ঠামা!" ঠাকুরমার আর তখন গালি দেওয়া হইত

না, খুকীকে কোলে করিয়া তিনি অন্যত্র চলিয়া যাইতেন। এইরূপে খুকী তাহার সুধা-ঢালা কথার বর্ম্মে তাহার অভাগিনী মাতার দেহ-মন অক্ষত রাখিতে চেষ্টা করিত।

মন্দভাগ্যা নির্ম্মলা তাহার শাশুড়ীর সমস্ত কটু কথাকে আশীর্ব্বাদের মত গ্রহণ করিয়া তাঁহার আশ্রয়ের ছায়ায় দিনগুলি কাটাইয়া দিত। কিন্তু ইহাও তাহার ভাগ্যে সহিল না। এমনই দুরদৃষ্ট লইয়া এ সংসারে সে আসিয়াছিল!

অনুপমের মাতা যখন দেখিলেন যে, অনুপম টাকার জন্য তাহাকেও অরশেষে পীড়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন তিনি তাঁহার ভ্রাতাকে ডাকাইয়া আনিয়া বাটী ত্যাগ করিয়া কাশীধামে চলিয়া গেলেন।

যাইবার সময় নির্ম্মলা তাঁহার দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া বড় কাঁদিয়াছিল, "মা, আমাকে একলা ফেলে যাবেন না, আমি বড় অভাগিনী।" নির্ম্মলার সেদিনকার এই কথা কয়টিতে অনুপমের মাতার কঠিন হৃদয়ও দ্রবও হইয়া গিয়াছিল, তাই বিদায় লইবার পূর্ব্বে এই প্রথম তিনি নির্ম্মলাকে স্নেহের চক্ষে দেখিলেন, বলিলেন, "মা, আমি সব জানি, কিন্তু আমার আর থাকবার জো নেই। তোমাকে একলা ফেলে আর যেতে ইচ্ছে কর্‌চে না, কিন্তু কি করব! তবে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ ক'রে যাচ্ছি, তোমার কোন কষ্ট থাক্‌বে না, অনুপমেরও সুমতি হবে। তুমি দেখ আমার আশীর্ব্বাদ কখন বৃথা হবে না।" আজ বহুদিন পরে তাঁহার বধূমাতার জন্য দুই ফোঁটা চোখের জল ফেলিয়া তিনি বাটী ত্যাগ করিয়া গেলেন।

তাহার শাশুড়ীর আশীর্ব্বাদ যে নিষ্ফল হইবে না, তাহা সে মনে মনে বুঝিলেও কেমন একটা অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কায় নির্ম্মলার অন্তর কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল।

খুকীকে দোসর করিয়া নির্ম্মলা আজ শ্বশুরবাড়ীর কর্ত্রী হইল। তাহাদের এই সংসারের মধ্যে যত্ন করিবার রহিল মাত্র তাহার স্বামী ও কুসুমকলি সদৃশ সুন্দর মেয়েটি। তাহার স্বামী ত' এ বাড়ীর কোনরূপ আদর-যত্ন চাহে না—সে আপনাকে আদর-যত্নের অনেক বাহিরে লইয়া গিয়াছে।

নির্ম্মলা এতদিন মুখ বুজিয়া সমস্ত সহিয়া আসিয়াছে। গায়ের গহনা একে একে সমস্তই তাহার স্বামীর হাতে তুলিয়া দিয়াছে এবং মৃত্যুর সময় নির্ম্মলাকে তাহার পিতা যে পাঁচ শত টাকা দিয়া গিয়াছিলেন, তাহা দিয়া সে নিজেই স্বামীর মদের মূল্য যোগাইয়া আসিয়াছে। আর তাহার কিছুই নাই! তাই এখন স্বামীর প্রহারই তাহার অঙ্গের ভূষণ হইয়াছে এবং জীবনধারণের পক্ষে আহার্য্য সামগ্রীর মত এই প্রহারটাকেও সে একটা নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুর মধ্যে ধরিয়া লইয়াছিল।

কিন্তু আর চুপ করিয়া থাকিলে চলিবে না, সে একা হইলে কিছুরই আবশ্যক হইত না, সে যে এখন সন্তানের জননী! জননীর কর্ত্তব্য তাহাকে পালন করিতেই হইবে।

তাহার হাতে একটি কপর্দ্দকও আর অবশিষ্ট নাই, ঘরে খাদ্যসামগ্রী যাহা আছে, তাহাতে অতি কষ্টে সপ্তাহখানেক চলিতে পারে। যে গোয়ালা দুধ যোগান দিত, তাহার অনেক বাকি পড়িয়া গিয়াছে। প্রতিদিনই সে শাসাইয়া যাইতেছে, দুধ বন্ধ করিয়া দিবে। দুধ বন্ধ করিয়া দিলে সে কি খাওয়াইয়া তাহার খুকীকে বাঁচাইয়া রাখিবে? এই সব দুশ্চিন্তা তাহার অন্তরের মধ্যে কেবলই তোলপাড় করিতে লাগিল। সে কি করিবে? ভাবিয়া চিন্তিয়া নির্ম্মলা স্থির করিল, খুকীর জন্য সে আজ স্বামীর সঙ্গে কলহ করিবে। প্রহার না হয় খুব বেশী করিয়াই

থাইবে, তবুও সে ইহার মীমাংসা করিয়া লইবেই, না হইলে যে তাহার খুকী দুধের অভাবে শুকাইয়া যাইবে।

(৩)

দুই দিন অনুপম বাড়ী আসে নাই। এরূপ সে প্রায়ই করিত। নির্ম্মলা উনানে ভাতের হাঁড়ি চাপাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল, পিছনে বসিয়া খুকী আপন মনে কত গল্প করিতেছিল আর এটা-ওটা-সেটা লইয়া খেলায় মত্ত ছিল। এমন সময় রক্তবর্ণ-চক্ষু, অনুপম বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। নির্ম্মলা ত্রস্ত হইয়া ভাতের হাঁড়ি নামাইয়া খুকীকে কোলে লইয়া স্বামীর সম্মুখীন হইল।

জড়িতস্বরে অনুপম কহিল, "শীগ্‌গির টাকা দে, দেরী করিস্‌নে, দে, দে, আমায় এখনি বেরুতে হবে।"

নির্ম্মলা শান্ত-সহজ-স্বরে উত্তর করিল, "তুমি অমন ব্যস্ত হচ্চ কেন? একটু ব'স, ঠাণ্ডা হও, তার পর না হয় বেরিয়ো, এতদিন পরে এলে, খুকীকে একবার কোলে নাও।"

খুকীও তখন বলিয়া উঠিল, "মা, বাবা কাছে যাব।"

মদের মাত্রাটা এতই অধিক হইয়াছিল যে, খুকীর সেই সুমিষ্ট আহ্বান অনুপমের মনের উপর একটুও দাগ কাটিতে পারিল না। খুকীকে সে ধমক দিয়া বলিয়া উঠিল, "চুপ, বাবার কাছে আস্‌তে হবে না।"

ধমক খাইয়া খুকী ভয়ে জড়সড় ও কাঁদ-কাঁদ হইয়া মায়ের কাঁধের উপর মুখ লুকাইল।

অনুপম উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল, "দিবিনি টাকা?"

নির্ম্মলা খুকীকে শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিয়া উত্তর করিল,—"আমি টাকা কোথায় পাব, যা ছিল, সব ত' তোমায় দিয়েছি।"

"ফের মিথ্যা কথা,দে বল্‌চি, না হ'লে দেখ্‌বি।" বলিয়া অনুপম টলিতে টলিতে নির্ম্মলার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। নির্ম্মলা এক পা নড়িল না, দৃঢ়-কণ্ঠে কহিল, "মার, একবারে মেরে ফেল, তাতে আমার কোন দুঃখ নেই, কিন্তু খুকীর খাওয়ার বন্দোবস্ত ক'রে দাও। তুমি না দেখলে তাকে আমি কি ক'রে বাঁচাব? গয়লা বলেছে দুধ বন্ধ ক'রে দেবে। তোমার পায়ে পড়ি, খুকীর দুধ যেন না বন্ধ করে দেয়। সে যে না খেয়ে মরবে। তোমায় ছুঁয়ে বল্‌চি, আমার আর কিছু নেই।"

অনুপম বোধ হয়, তখন কোন স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করিতেছিল; সেখানে কেবলই টাকার প্রয়োজন। তাই নির্ম্মলার ও সব কথা তাহার মোটেই ভাল লাগিল না এবং বৃথা বিলম্ব হইয়া যাইতেছে দেখিয়া সে চেঁচাইয়া উঠিল, "কি, আমার পা ছুঁয়ে মিথ্যে কথা, এত বড় তোর বুকের পাটা, আচ্ছা, আজ চল্লুম, ফিরে এসে এর শোধ তুলব।" বলিয়া অনুপম সত্যই চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

নির্ম্মলা প্রমাদ গণিল। খুকীর জন্য তাহার অন্তর হাহাকার করিয়া উঠিল। সে এক হাতে খুকীকে চাপিয়া ধরিয়া আর এক হাত দিয়া অনুপমের হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "না, তোমাকে আজ কিছুতেই যেতে দেব না।"

অনুপম গর্জ্জিয়া উঠিল, "কি!"

নির্ম্মলা কাতরকণ্ঠে কহিল, "যেতে হয় যাও, কিন্তু খুকীকে নিয়ে যাও, আমি তাকে কি খাওয়াব, সে যে না খেয়ে মারা যাবে। তোমার মেয়ে, তুমি নিয়ে যাও, ওগো, আমার মাথার দিব্যি তুমি ওকে ফেলে যেও না।"

বেচারী খুকী তখন ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া মায়ের বুকের সঙ্গে একেবারে মিশিয়া ছিল।

দিক্‌বিদিক্‌জ্ঞান-হারা প্রমত্ত অনুপম সজোরে নিজের হাত ছিনাইয়া লইয়া "আমার সঙ্গে চালাকি—বজ্জাতি" বলিয়া নির্ম্মলাকে এক ধাক্কা মারিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল। নির্ম্মলা খুকীকে বাঁচাইতে গিয়া আপনাকে সামলাইতে পারিল না। দুই হাতে খুকীকে বুকের উপর ধরিয়া রাখিয়া সশব্দে মেঝের উপর পড়িয়া গেল। মাথা কাটিয়া ফিন্‌কি দিয়া রক্ত ছুটিল। একরাশ কালো চুলের মধ্যে রক্ত যেন বেশী লাল হইয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিল। খুকী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। নির্ম্মলা তাড়াতাড়ি উঠিয়া খুকীর গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল। খুকী তখন ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া বলিতে লাগিল, "মা, বাবা কাছে যাব, বাবা কাছ যাব।"

৪

দশ দিন কাটিয়া গিয়াছে। অনুপম সত্যই এত দিন বাড়ী আসে নাই। তাহার ইহকাল পরকালের বন্ধু সেই জমিদারের পোষ্য আশ্রিত প্রসাদ-ভোজী মোসায়েব হইয়া সে নৌকাযোগে জলবিহারে বাহির হইয়াছে। বাড়ীতে যে তাহার স্ত্রী এবং শিশুকন্যাটি না খাইয়া মরিতে বসিয়াছে, তাহা মনে আনিবারও তাহার অবকাশ ছিল না।

আজ সাতদিন হইল, গোয়ালা দুধ বন্ধ করিয়া দিয়াছে। কয়দিন চাল সিদ্ধ করিয়া তাহাই নির্ম্মলা এক বেলা মেয়েকে খাওয়াইয়াছে এবং এক-মুঠা সে নিজেও খাইয়াছে। মেয়ের মুখ চাহিয়া তাহাকে খাইতে হইয়াছিল। দুপুরে, সন্ধ্যায় ও রাত্রে যখন ক্ষুধার তাড়নে খুকী কাঁদিতে থাকিত, তখন চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে নির্ম্মলা ছোট একটা বাটিতে করিয়া

খানিকটা 'ফেন' লইয়া খুকীর মুখের সামনে ধরিত ; সে মহোল্লাসে তাহাই কত তৃপ্তির সহিত খাইয়া ফেলিত।

কিন্তু চালও ফুরাইয়া আসিল! নির্ম্মলা তখন ঘরের মধ্যে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার ইচ্ছা হইতে লাগিল, ছুটিয়া বাহির হইয়া তাহার স্বামীর পায়ের উপর খুকীকে ফেলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া মৃত্যুকে সে বরণ করিয়া লয়। কিন্তু তাহার স্বামী কোথায় গিয়াছে,তাহা সে জানে না। তাহার উপর সে বাড়ীর বাহিরও কোন দিন হয় নাই, পথ-ঘাটও কিছুই সে চেনে না। এই ঘর কয়টির মধ্যেই তাহার চলা-ফেরার সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে, বাহিরে এক পা যাইবার জো তাহার নাই! সে যে হিন্দু গৃহস্থের বধূ! পথে বাহির হইলে তাহার জাত যাইবে! পথের দিকে চাহিলেও তাহার স্বামীর মানের লাঘব হইবে; তাহার পাতিব্রত্য-ধর্ম্মে বাধা পড়িবে! সম্মুখে তাহার বাছা ক্ষুধার যন্ত্রণায় ছট্‌ফট করিতে থাকিবে, তাহাকে বসিয়া বসিয়া তাহাই দেখিতে হইবে! বাটীর বাহিরে গিয়া সন্তানের খাওয়াইবার কোন পথই সে করিতে পারিবে না। মদ্যপায়ী কদাচারী স্বামীর যে তাহাতে অগৌরব হইবে!

তবুও আর একটা দিন নির্ম্মলা খুকীকে কিছু আহার যোগাইতে পারিল। এ-ঘর সে-ঘর খুঁজিয়া সে কতকগুলি ভাঙ্গাচুরা জিনিসপত্রের মধ্যে আধ কৌটা বালি সন্ধান করিয়া বাহির করিল। তাহা এতই পুরান হইয়া গিয়াছিল যে, বালির স্বাভাবিক রঙ্‌ তাহাতে ছিল না। কৌটা দেখিয়া তাহা বালি বলিয়া চেনা যায় না। তাহাই সিদ্ধ করিয়া যখন নির্ম্মলা উনান হইতে নামাইল, তখন তাহার মনে হইল, যেন স্বহস্তে খানিকটা বিষ প্রস্তুত করিয়া সে তাহার খুকীকে খাইতে দিতে চলিয়াছে। নির্ম্মলা প্রথমে নিজে খানিকটা খাইয়া ফেলিল, তার পর নিদ্রিত খুকীকে জাগাইয়া খানিকটা তাহাকে খাইতে দিল। খুকী বার দুই মাতার মুখের

দিকে নিঃশব্দে চাহিল, বারদুই পাত্রের দিকে চাহিল, তার পর এক চুমুক খাইয়া থামিল ; মাতার মুখের দিকে আবার তেমনি করুণ ভাবে চাহিল, তার পর চুমুক দিয়া অনেকখানি খাইয়া ফেলিল। নির্ম্মলা কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহা বেশ করিয়া দেখিল। নির্ম্মলা ভাবিল,বেশ হইয়াছে, দুই জনে একসঙ্গে মরিতে পারিব। কিন্তু কিছুই হইল না, মা ও মেয়ে তাহা স্বচ্ছন্দে হজম করিয়া ফেলিল।

৫

নির্ম্মলার সেদিনকার দুঃখের রাত্রিও প্রভাত হইল। [illegible] কোলাহলে কলিকাতার আকাশ বাতাস ভরিয়া গেল। নির্ম্মলা খুকীকে কোলে করিয়া দরজার ফাঁক দিয়া কাহার প্রতীক্ষায় চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। চাহিয়া চাহিয়া সে দেখিতে লাগিল, কত লোক কত রকমের খাদ্য-দ্রব্য লইয়া তাহারই বাটীর সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করিতেছে। কত গাড়ীর ছাতে ঝাঁকা বোঝাই করিয়া আহার্য্য সামগ্রী লইয়া গাড়ী ছুটিয়া চলিয়াছে। ক্ষীণকণ্ঠে খুকী তখন কহিল, “মা, ক্ষিধে– মা, খাবার।” নির্ম্মলার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। এত লোক এত খাবার লইয়া যাইতেছে, আহা, তাহার বাছাকে কি কেহ একটু কিছু দিবে না! মাত্র তাহার দুই হাত দুর দিয়া এত খাবার যাইতেছে, আর তাহার বাছা ক্ষুধার যন্ত্রণায় অধীর হইয়া ছট্‌ফট করিতেছে। উহাদের একবার ডাকিয়া বলি, ‘আমার বাছাকে একটু কিছু দিয়া যাও, কা’ল রাত্রি থেকে বাছা আমার উপবাসে আছে,ওগো,তোমরা একটু কিছু দিয়ে যাও।’ শেষ কয়টি কথা নির্ম্মলা সত্যই একটু জোরে বলিল, কিন্তু লোক-কোলাহলের মধ্যে তাহা কোথায় মিশিয়া গেল। অনেকেই শুনিতে

পাইল না, দুই একজন যাহারা বা শুনিতে পাইল, তাহারা একবার ফিরিয়া চাহিয়া সোজা চলিয়া গেল।

খুকী অবসাদে নির্ম্মলার কাঁধের উপর এলাইয়া পড়িয়াছে। বেলাও ক্রমে বাড়িয়া উঠিয়াছে, ক্ষুদ্র গলির মধ্যে লোকজনের চলাফেরাও অনেক কমিয়া আসিয়াছে। নির্ম্মলা আর ঘরের মধ্যে স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না। মেয়েটিকে কাঁধে ফেলিয়া ঘরের সম্মুখে রাস্তার উপর আসিয়া দাঁড়াইল। সে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছে, যেমন করিয়া হউক, কিছু খাবার সে সংগ্রহ করিবেই! সে যে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিল, এখনি কিছু না খাওয়াইতে পারিলে তাহার খুকীর এ ঘুম আর ভাঙ্গিবে না!

অসহ্য যন্ত্রণায় নির্ম্মলা রাস্তায় আসিয়া পড়িয়া প্রথমে বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িল। থর-থর করিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। চোখের দৃষ্টি মলিন হইয়া আসিল। কোন রকমে দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল। কতক্ষণ এমনিভাবে সে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহা সে জানিতেও পারে নাই, হঠাৎ যখন তাহার চমক ভাঙ্গিল, খুকীর দিকে চাহিয়া যে শিহরিয়া উঠিল। তখন তাহার সম্মুখ দিয়া একটি স্ত্রীলোক বাজার করিয়া ফিরিতেছিল, নির্ম্মলা তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "ওগো, আমার বাছাকে একটু খেতে দিয়ে যাও।"

সে স্ত্রীলোকটি একবার ফিরিয়া চাহিল, ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিয়া উঠিল, "মর্ মাগী, খাওয়াতে পারিস্‌নি ত পেটে ধরেছিলি কেন? উনি ধরবেন পেটে, আর পাঁচজনে ওঁর বাছাকে খাওয়াবে! কি আদিখ্যেতারই কথা! বয়স রয়েছে, খেটে খেগে না।" বলিয়া মুখ ঘুরাইয়া বকিতে বকিতে সে চলিয়া গেল। নির্ম্মলার উচ্ছ্বসিত অশ্রু গণ্ড বাহিয়া তাহার বুক ভাসাইয়া দিল।

একটি বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক মন্থর-গমনে তখন তাহাকে অতিক্রম করিয়া

যাইতেছিল নির্ম্মলা অমনই ভাঙ্গা-গলায় বলিয়া উঠিল, "ওগো তোমার পায়ে পড়ি,আমার বাছাকে একটু খেতে দাও।" তাহার ব্যথিত কণ্ঠস্বরে রমণীটির বোধ হয় একটু দয়া হইল. সে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি বল্‌ছিলে গা বাছা তুমি ?"

নির্ম্মলা যেন কূল পাইল, সাগ্রহে বলিল, "মা, বাছাকে আমি কাল রাত থেকে কিছু খেতে দিতে পারিনি, তোমার পায়ে পড়ি মা, তুমি একটু কিছু ওকে খেতে দাও।"

সেই স্ত্রীলোকটির হাতে একটি দুধের ঘটি ছিল। সেই ঘটিটি নির্ম্মলার হাতে দিয়া বলিল, "নাও বাছা, এই দুধটুকু তোমার মেয়েটিকে খাওয়াও, চল ভেতরে গিয়ে তোমার সব কথা শুনি।"

নির্ম্মলার ধড়ে যেন এতক্ষণে প্রাণ আসিল। ভগবান্‌কে মনে মনে প্রণাম করিয়া স্ত্রীলোকটির মঙ্গল-কামনা করিতে করিতে বাটীর ভিতর সে প্রবেশ করিল।

খুকীকে বার দুই ঠেলিয়া জাগাইয়া তাড়াতাড়ি নির্ম্মলা পাত্রের সমস্ত দুধটুকু একেবারে খাওয়াইয়া দিল। অনেকদিন পর দুধ খাইয়া খুকীর মুখে আজ হাসি দেখা দিল। কি মধুর সে হাসি!

তার পর সেই রমণী একে একে নির্ম্মলার সমস্ত অবস্থা শুনিল। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া গম্ভীর হইয়া বলিল, "তোমার কোন ভাবনা নেই বাছা, তোমার মেয়েটি যাতে খাওয়া-পরার কোন কষ্ট না পায়, তার ব্যবস্থা আমি করব। আর তোমারও হাতে যাতে দু'পয়সা হয়, তাও ক'রে দেব, আমি এখন যাই. শীগ্‌গির তোমাদের জন্যে কিছু খাবার নিয়ে আসি। আহা, বাছা, তোমরা উপোস ক'রে আছ, যাই, আর দেরী করব না।" বলিয়া রমণী ধীরে ধীরে উঠিয়া চলিয়া গেল।

খুকী আজ আবার ঘরময় ছুটাছুটি করিয়া খেলিতে লাগিল, আর

নির্ম্মলা সমস্ত যন্ত্রণা ভুলিয়া তন্ময় হইয়া তাহাই দেখিতেছিল। খেলিতে খেলিতে হঠাৎ খুকী থামিয়া গেল, এবং 'ওয়াক' তুলিল। সেই শব্দে নির্ম্মলার সুখস্বপ্ন নিমেষে কোথায় উড়িয়া গেল, সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া খুকীকে কোলে লইবার পূর্ব্বেই খুকী সমস্ত দুধটুকু বমন করিয়া ফেলিল। ক্ষুধার তাড়নায় কাঁচা দুধটুকু এক নিঃশ্বাসে তখন উদরের মধ্যে স্থান পাইয়াছিল, কিন্তু খুকীর সেই উপবাসী উদর তাহা নিজের আয়ত্তে রাখিতে পারিল না।

নির্ম্মলা খুকীর মুখ মুছাইয়া কোলে তুলিয়া চুমু খাইয়া গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল; এমনি করিয়া কখন্ যে বেলা পড়িয়া আসিয়াছিল, নির্ম্মলা তাহা বুঝিতে পারে নাই। খুকী যখন 'মা, ক্ষিধে, মা, ক্ষিধে' বলিয়া আবার কাঁদিতে সুরু করিল, তখন খুকীকে লইয়া সে তেমনি বিব্রত হইয়া পড়িল।

সেই দয়াময়ী স্ত্রীলোকটির জন্য নির্ম্মলা বার বার পথের পানে চাহিতে লাগিল।

অল্পক্ষণ পরে সেই স্ত্রীলোকটি আসিল। দূর হইতে তাহাকে দেখিতে পাইয়া নির্ম্মলা বাঁচিয়া গেল এবং তাহার সম্পূর্ণ ভরসা হইল, খুকীর জঠরের অনল সে কতক পরিমাণে নির্ব্বাণ করিতে পারিবে। কিন্তু স্ত্রীলোকটি কাছে আসিতেই সে সভয়ে দেখিল, তাহার হাত শূন্য! আহার্য্য-সামগ্রী কিছুই তাহার সঙ্গে নাই। নির্ম্মলার গলা শুকাইয়া উঠিল। তাহার মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না।

স্ত্রীলোকটি বসিয়া কহিল, "দেখ বাছা, তোমার মেয়ের জন্য দুধ ত যোগাড় কর্‌তে পার্‌লাম না, আমি গরীব মানুষ, পরের বাড়ী খেটে খাই, তা আবার দু'মাস মাইনে পাইনি, হাতে একটিও পয়সা নেই যে, কিছু কিনে আনি, কত লোকের কাছে একটা পয়সা ধার চাইলুম, কি বল্‌ব

বাছা, এমনি সব লোক যে, একটা পয়সা দিতে পারলে না!"

নির্ম্মলা আর শুনিতে পারিতেছিল না। একটা বুক-ভাঙ্গা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "তা হ'লে কি হবে মা, আমার খুকী—" আর কিছু সে বলিতে পারিল না, কাঁদিয়া ফেলিল।

স্ত্রীলোকটি সান্ত্বনার স্বরে কহিল, "বাছা, অত উতলা হ'লে কি চলে, আমি যখন বলেচি, একটা উপায় না ক'রে কি আর ফিরে এসেচি বাছা।"

নির্ম্মলা সাগ্রহে বলিয়া উঠিল, "আমার খুকী তা হ'লে খেতে পাবে?"

"পাবে গো বাছা পাবে। আগে শোন সব কথা। আমার মনিবটির বড় দয়ার শরীর, তাঁকে সব কথা বল্‌লাম, তিনি তোমার মেয়ের খাওয়া-পরার সব ভার নিতে রাজি আছেন, যদি বাছা তুমি একটি কাজ করতে পার?"

"হাঁ মা, আমি পারব, তুমি যা বলবে, তাই করব।"

"দেখ বাছা, মনিবের আমার কোন ছেলেপুলে হয় নি, তাই তোমার মেয়েটিকে"—বলিয়া দুই একবার ঢোক গিলিয়া পুনরায় কহিল, "নিজের করে নিতে চান।"

বিস্ফারিত-নয়নে নির্ম্মলা তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। খুকীকে বেচিতে হইবে! খাদ্যের অভাবে বাছাকে এ জন্মের মত পর করিয়া দিতে হইবে!

স্ত্রীলোকটি একটু রুষ্টস্বরে কহিল, "দেখ বাছা, অমন ক'রে [illegible] থাকলে কি হবে; তোমার জিনিস, ইচ্ছে হয় দেবে [illegible] না দেবে; আমার কি বল, তোমার মেয়েই খেয়ে পরে সুখে থাকুক, আমার তাতে কি লাভ বল ত বাছা! তুমি কান্নাকাটি ক'রে মরলে, আর আমি কেমন

এ সব দেখে চুপ ক'রে থাক্‌তে পারি নি, তাই, না হ'লে নিজের কাজ ক্ষেতি ক'রে আমার কি দায় পড়েছিল? দেখ বাছা, যদি মেয়েটার দুঃখ ঘোচাতে চাও ত বল। আর টাকা—তাই বা কত চাও, তাও আমার বাছা সব স্পষ্ট কথা, সোজা কাজ।"

নির্ম্মলা তথাপি চুপ করিয়া রহিল, কি উত্তর সে দিবে! খুকী তখন তাহার কোলের উপর চোক বুজিয়া পড়িয়াছিল, হঠাৎ ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া মায়ের গলা ধরিয়া ক্ষীণকণ্ঠে কহিল, "মা, মা গো, বড্‌ড খিদে।"

নির্ম্মলা আর স্থির থাকিতে পারিল না; কহিল, "আমি বেচব। হ্যাঁ বাছা, সত্যি বলচ, তারা আমার খুকীকে পেট ভ'রে খেতে দেবে?"

"দেবে গো বাছা দেবে, আমি কি আর মিথ্যে বলচি, আমার কথায় পেত্যয় না হয়, তুমি নিজে গিয়ে না হয় দেখে এস বাছা, তা হ'লে ত হ'ল।" স্ত্রীলোকটির সুরটি তখন অনেক নরম হইয়াছে।

নির্ম্মলা আগ্রহভরে কহিল, "আমাকে দেখতে দেবে? খুকীকে এক একবার কোলে করতে দেবে?"

"তোমার মেয়ে, তুমি গিয়ে কোলে করবে, সে একটা মস্ত কথা কি? তবে এখন দাও মেয়েটিকে আমার কোলে, সন্ধ্যা হ'য়ে গেল, আমার অনেক কাজ প'ড়ে আছে। কত টাকা নেবে বাছা, ব'লে ফেল ত।"

কম্পিতকণ্ঠে নির্ম্মলা কহিল, "টাকা! আমার টাকার দরকার নেই মা! তুমি আমার জন্যে যখন এত করলে, তখন আর একটু দয়া কর মা, তোমার মনিব বড়লোক, তাঁর বাড়ী আমার চাকরী ক'রে দাও। আমায় একবেলা শুদ্ধ চারটি খেতে দেবে—দু'বেলাও চাই নি। যে কাজ করতে বলবে, সব করব।"

স্ত্রীলোকটি একগাল হাসিয়া বলিল, "আমার মনিব খুব বড়লোক বাছা, তিনি মাইনে দিয়ে ত পাঁচটা দাসী-চাকর রেখে থাকেন, তোমাকেও

না হয় রাখবেন। আর তুমিই বা এমনি খাটবে কেন, আমার মনিব তেমন লোকই নন যে, অমনি কাকে খাটাবেন, আর আমি পুরোণ দাসী, আমার কথা তিনি কখনই ঠেল্‌তে পারবেন না।”—বলিয়া আঁচলের প্রান্তদেশ হইতে দশটি চক্‌চকে টাকা বাহির করিয়া নির্ম্মলার সম্মুখে রাখিয়া দিয়া বলিল, “এই নাও বাছা দশটা টাকা - চাকরী ত তোমার হবেই।”

নির্ম্মলা ব্যথিত-কণ্ঠে কহিল, “মা, আমি টাকা চাই না, তুমি আমায় সঙ্গে নিয়ে চল। খুকীকে ফেলে একলা আমি থাকতে পারব না।”

সহানুভূতির স্বরে স্ত্রীলোকটি কহিল, “মেয়েটিকে একবার দেখিয়ে আনি, তুমি ততক্ষণ সব গুছিয়ে-গাছিয়ে রাখ, আমি ফিরে এসে তোমায় সঙ্গে ক’রে নিয়ে যাব।”

“আচ্ছা” বলিয়া নির্ম্মলা খুকীকে খানিকক্ষণ বুকের সঙ্গে চাপিয়া ধরিয়া চক্ষু মুদিত করিয়া রহিল। তাহার খুকী আজ এই প্রথম তাহার চক্ষুর অন্তরালে চলিয়া যাইবে। খুকীর অদর্শন সে কি করিয়া সহ্য করিবে!

স্ত্রীলোকটি একটু উচ্চকণ্ঠে কহিল, “আর দেরী ক’র না, খুকীকে আমায় দাও।”

“এই নাও মা” বলিয়া নির্ম্মলা খুকীর মুখখানি তাহার বুকের উপর হইতে তুলিয়া ধরিয়া মনের সাধে চুমু খাইয়া চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে কহিল, “যা মা, তোর নতুন মার কাছে যা, সে তোকে পেট ভ’রে খেতে দেবে।” এই বলিয়া সে খুকীকে ধীরে ধীরে স্ত্রীলোকটির কোলের উপর বসাইয়া দিল। খুকী কাঁদিয়া উঠিল, বলিল, “আমি যাব না।”

অশ্রুবিগলিত-নয়নে নির্ম্মলা খুকীর দিকে চাহিয়া রহিল। স্ত্রীলোকটি

অবিলম্বে রোরুদ্যমানা খুকীকে লইয়া বাটীর বাহির হইয়া গেল।

খুকীর সেই কাতর ক্রন্দন, "ও মা, আমি যাব না, আমি যাব না," নির্ম্মলার বুকে তপ্ত শেলের মত বিঁধিতে লাগিল। তবুও নির্ম্মলা সেই স্বর শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া রহিল। ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া সে স্বর যখন দূর আকাশে মিলিয়া গেল, নির্ম্মলা তখন আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহার দুঃখে বাটীর শূন্য ঘরগুলি যেন আজ হাহাকার করিয়া উঠিল।

সহসা নির্ম্মলা ক্রন্দন রোধ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার মনে পড়িল, এখনি যে তাহাকে লইতে আসিবে। তাহাকে যে প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতে বলিয়া গিয়াছে।

কি লইয়া সে প্রস্তুত হইবে! খুকীই যে তাহার সব ছিল। হঠাৎ তাহার মনে পড়িল, খুকী যে শুধু হাতে চলিয়া গিয়াছে। তাহার পুতুল-গুলি, পুতুলের পোষাক—সমস্তই সে যে ফেলিয়া গিয়াছে। তাহাই গুছাইয়া লইবার জন্য সে উঠিয়া গেল। পাঁচ ছয়টি কাঁচের পুতুল, তার মধ্যে কাহারও বা হাত কাটা, কাহারও বা পা ভাঙ্গা এবং সাদা, লাল, কাল, নানা রঙ্গের ন্যাকড়ার টুক্‌রা—খুকীর কত আদরের সামগ্রী—একটি ছোট পুঁটুলীর মধ্যে বাঁধিয়া সেই স্ত্রীলোকটির অপেক্ষায় ব্যাকুল হইয়া সে পথের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

৬

রাত্রি আট্‌টা বাজিয়া গিয়াছে। পাশে জমিদার-বাড়ীতে তখন গানের মজলিস বসিয়াছে। আনন্দের কোলাহল জমিদার-গৃহ ছাপাইয়া দীন-দুঃখীর কুটীরে আসিয়া উপহাস করিয়া ফিরিতেছে।

. এমন সময় অনুপম আসিয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল। দরজা খোলাই পড়িয়াছিল। অনুপম দেখিল, নির্ম্মলা মেজের উপর পড়িয়া আছে, খুকী সেখানে নাই। নির্ম্মলার শিয়রের অনতিদূরে একটি ছোট পুঁটুলী ও কয়েকটি টাকা পড়িয়া আছে। আজ অনুপমের টাকার একান্ত প্রয়োজন হইয়াছিল, এবং সেই জন্যই নির্ম্মলার উপর পীড়ন করিয়া টাকা বাহির করিয়া লইতেই সে আসিয়াছিল; সম্মুখে টাকা দেখিয়া সে উৎফুল্লিত হইল, কিন্তু অন্তরে নির্ম্মলার উপর অত্যন্ত চটিয়া গেল, "আমার সঙ্গে চালাকি, টাকা নেই! আচ্ছা, আজ ফিরে আসি, তার পর মজা টের পাওয়াব।" বলিতে বলিতে টাকা কয়টি তুলিয়া লইল; এবং পুঁটুলীর মধ্যে হয় ত আর কিছু টাকা লুকান আছে মনে করিয়া পুঁটুলিটী খুলিয়া খুকীর খেলার সামগ্রী সেই পুতুলগুলিকে এদিক্ ওদিক্ ছড়াইয়া ফেলিয়া কিছু না পাইয়া নির্ম্মলাকে আর একবার শাসাইয়া সে বাটীর বাহির হইয়া গেল।

মদের দোকান বন্ধ হইবার দেরী নাই দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি একটি দোকানে ঢুকিয়া পড়িয়া ঝণাৎ করিয়া টাকা ফেলিয়া দিয়া এক বোতল মদ কিনিল। দ্রুত বোতলের মুখ খুলিয়া একটা গেলাসে ঢালিয়া 'চুমুক' দিতেই তাহার গলায় গিয়া যেন তাহা আটকাইয়া গেল। দোকানীকে উল্লেখ করিয়া বলিতে লাগিল, "কি বাবা, কেমন মদ যে আমার গলায় আটকে যায়! এ বাবা কেমন মদ।" দোকানী বসিয়া হাসিতে লাগিল। অনুপম তখন মদের বোতল বগলে করিয়া রাস্তায় নামিয়া পড়িল।

বাকী কয়টি টাকা এবং বগলে মদের বোতল লইয়া চিৎপুরে একটি পুরাতন ঝরঝরে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া উপরে উঠিয়া গিয়া অনুপম হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল। যেন কাহার পরিচিত স্বর তাহার কানে

আসিয়া বাজিল। সে ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না, এ স্বর কোথা হইতে আসিতেছে।

এমন সময় একটি স্থূলকায়া রমণী একটি মেয়ে কোলে লইয়া গালি দিতে দিতে তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "এই যে, এস এস, বাইরে দাঁড়িয়ে কেন; ভেতরে এস!"

অনুপমের পা উঠিল না, সেইখানেই সে নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। মেয়েটা তখন জোরে কাঁদিয়া উঠিল। অসহ্য বোধ হওয়ায় স্ত্রীলোকটি সজোরে তাহার পিঠের উপর এক চড় বসাইয়া দিয়া বলিল, "মরছিলি না খেয়ে, আমি পেট ভরে খেতে দিলাম কি না, এখন কাঁদবি বই কি, 'মা' 'মা' ক'রে কেঁদে মরছে দেখ না।" মেয়েটি তাহার কথা বুঝিতে পারিল না, সে 'মা কাছে যাব' বলিয়া আরও জোরে কাঁদিয়া উঠিল। "খুদী, নিয়ে যা মেয়েটাকে সামনে থেকে, যতক্ষণ না চুপ করে, খুব ক'রে ঠেঙাবি। ঠ্যাঙার ভয়ে ভূত পালায়, আর একরত্তি একটা মেয়ে চুপ করবে না?"

অনবরত কাঁদিয়া কাঁদিয়া মেয়েটির মুখ-চোক ফুলিয়া উঠিয়াছে। প্রহারে তাহার সমস্ত পিঠ লাল হইয়া গিয়াছে।

অনুপম মেয়েটির পানে একবার চাহিয়া প্রস্তরের মত কঠিন হইয়া গেল।

অনুপমকে শুনাইয়া শুনাইয়া সেই স্ত্রীলোকটি বলিতে লাগিল, "আজ খুব দাঁও মারা গেছে, ঐ মেয়েটা দেখছিলে না, ও দু'দিন কিছু খেতে পায় নি, ওর বাপটা লক্ষ্মীছাড়া. মদ খেয়ে কোথায় প'ড়ে থাকে, মেয়েটার একবার খোঁজও নেয় না। মেয়েটার মাটা কিন্তু খুব ভাল, কিন্তু সে কি করবে, তার হাতে একটাও কড়ি ছিল না, ঘরে যা দুমুঠো চাল ছিল, তাই সিদ্ধ ক'রে মেয়েটাকে একবেলা খাওয়াত, পরে ক্ষিধে পেলে ফ্যান

ধ'রে রাখত, তাই খেতে দিত, তারপর চালও ফুরিয়ে গেল, তখন একে-বারে উপোস, কি করে, ভদ্দর ঘরের বউ, তবুও দরজার বাইরে এসে মেয়েটার জন্য খাবার চাইছিল, খুদীর মা তখন সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল, তার পর আর কি, খেতে পাবে ব'লে মা'টার কাছ থেকে মেয়েটাকে কিনে আন্‌লাম। বেচতে কি চায়! মেয়েটাকে ছাড়বে না ব'লে মা'টা কত কান্নাকাটি করতে লাগল। শেষে খুদীর মা যখন বল্লে, তাকেও একটু পরে আমাদের এখানে নিয়ে আসবে, তবে সে মেয়েটাকে ছাড়ে। খুব দাঁও মারা গেছে, দশ টাকায় এমন একটা মেয়ে, কি বল বাবু?"

কিছুতেই থামাইতে না পারিয়া খুদী মারিতে মারিতে মেয়েটিকে আবার ফিরাইয়া লইয়া আসিল। মেয়েটি কাঁদিতে কাঁদিতে হঠাৎ অনুপমের দিকে চাহিয়া চুপ করিল, ভাঙ্গা গলায় ডাকিল, "বাবা, বাবা!"

অনুপমের দেহ ধরিয়া কে যেন প্রবল ঝাঁকানি দিল। তাহার হাতের টাকা কয়টি যেন তীক্ষ্ণধার শলাকার মত তাহাকে বিদ্ধ করিতে-ছিল। ভীষণ যন্ত্রণায় সে ছট্‌ফট করিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে মুষ্টিচ্যুত টাকার ঝন্‌ঝনানি এবং চূর্ণ বোতলের ঠন্‌ঠনানি অনুপমের অন্তরের দারুণ যন্ত্রণার প্রতিধ্বনি করিয়া উঠিল।

'মা মা' বলিতে বলিতে অনুপম দুই এক পদ অগ্রসর হইয়া টলিতে টলিতে মেজের উপর পড়িয়া গেল।